পাঁচ-মিশেলি

শ্রীঅবনী নাথ রায়

ডি, এম্‌, লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার,
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
বি, পি, এমস্ প্রেস্
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা মাত্র।

মুখ পত্র

এ কয়টি প্রবন্ধের লেখক, শ্রীযুক্ত অবনী নাথ রায়, একজন প্রবাসী বাঙ্গালী। কয়বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্র নাথের ফাল্গুনী দিল্লীতে অভিনিত হয়, অবশ্য অভিনেতারা সকলেই ছিলেন, প্রবাসী বাঙালী। সেই সূত্রে শ্রীযুক্ত অবনী নাথ রায় ফাল্গুনী সম্বন্ধে যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন সেটি আমি সেকালের সবুজপত্রে উদ্ধৃত করে দিই। এই সূত্রে আমার তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে দিল্লী সহরে প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

তাঁর যে বলবার কথা আছে, আর তিনি যে তা বলতে পারেন এই ধারণাবশতঃই আমি তাঁর প্রবন্ধ সবুজপত্রে প্রকাশ করি। তার পর তিনি বাঙলার সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে পর পর যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, সেইগুলি একত্র করে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করছেন।

বাঙলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের তাদৃশ্য মর্য্যাদা নেই ; বাঙলা সাহিত্য যে-কোনও ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় এ বিষয়ে নিতান্তই হীন। বড় কবি বড় গল্পলেখকের সংখ্যা কোন দেশেই বেশি নয়, কারণ এ দুই ক্ষেত্রে তিনিই মাথাতুলে দাঁড়াতে পারেন যাঁর

অন্তরে আছে প্রতিভা। আর প্রতিভা হচ্চে সেই সহজ শক্তি যা আমাদের পাঁচজনের নেই আর যা শিক্ষা দীক্ষার প্রসাদে অর্জ্জন করা অসম্ভব। কিন্তু মন নামক বস্তু সকলেরই আছে। আর এই মনেরই প্রধান প্রকাশ প্রবন্ধ সাহিত্যে। 'এই কারণে আমি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষ পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস যে বাঙলীজাতির শিক্ষিত মন আছে, আর এ মনের রূপের ও শক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে, যখন বাঙলাভাষায় একটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য গড়ে উঠবে, যেমন ফরাসীভাষায় গড়ে উঠেছে। আর এক কথা, কাব্য সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্যের অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরাও বলেন যে উপযুক্ত "ভাবকের" (cretic) অভাবে কাব্যবৃক্ষ অবকেশি হয়ে পড়ে অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। কবিরা আমাদের যা দান করেন, তা যে আমাদের গ্রহণ করবার শক্তি আছে তার পরিচয় আমরা দিতে পারি শুধু critical সাহিত্যে। শ্রীযুক্ত অবনী নাথ রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎ সাহিত্যের মর্ম্ম, তিনি কি বুঝেছেন, তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তাই বলতে চেষ্টা করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিচারক স্বরূপে পাঠকের কাছে উপস্থিত হন নি। জজিয়তি করা যে ক্রিটিকের কাজ নয়, এ জ্ঞান তাঁর আছে।

লেখক প্রবাসী বাঙালী। অতএব এ প্রবন্ধগুলি থেকে পরিচয় পাওয়া যায় যে বাঙলা সাহিত্যের প্রভাব বাঙলার বাইরেও বাঙালীর মনের উপর কতটা আছে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর সামাজিক

বিষয়ে প্রবন্ধগুলি থেকে দেখা যায় যে প্রবাসী বাঙালীরা; আমাদের অনেক ঘরোয়া কুসংস্কার থেকে কতটা মুক্ত। এইসব কারণে, আমি আশা করি যে বাঙালী পাঠক সমাজে বইখানির আদর হবে। ইতি—

২১ শে এপ্রিল ১৯৩১। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

স্বর্গগতা

নারায়ণ দাসী দেবী

মাতৃ দেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশে—

সূচীপত্র

পাঁচ-মিশেলি

রবীন্দ্রনাথ ও অচলায়তন

রবীন্দ্রনাথ বলেচেন যে জন্মের বা মৃত্যুর যাঁদের দিনক্ষণ আছে তাঁদের কেউ স্মরণ করে না—সে দিনক্ষণ যাঁদের নেই তাঁরাই স্মরণীয় হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথকে তাই যদিচ আমরা আজ তাঁর জন্মদিনে বিশেষ করে স্মরণ করচি কিন্তু আমাদের জাতি তাঁকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করচে—তাঁর গান আমাদের কণ্ঠে, তাঁর ভাবধারা আমাদের চিন্তায়, তাঁর সৃষ্ট আদর্শ আমাদের সম্মুখে—এক কথায় আমরা তাঁর প্রতিভার ভিতর বাস করচি—এ যুগে তাঁর প্রতিভাকে অতিক্রম করবার সাধ্য আমাদের কারুর নেই।

আমার পক্ষে অবশ্য তাঁকে স্মরণ করবার অন্য কারণও আছে এবং সে কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমি তাঁর নিকট-সম্পর্কে এসেছিলুম। আজকের দিনে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করলে হয় ত আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না।

পাঁচ-মিশেলি

আজকের থেকে আঠার বছর আগে যে দিন বোলপুরে কবির একপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। আমার যতদূর জানা আছে সেই কবির প্রথম প্রকাশ্য সাধারণ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। তখনো তিনি নোবেল প্রাইজ পান নি। তাই 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তাঁর এই রকম পরিচয় দেওয়া হয়েছিল—"রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ করিয়াছেন—" ইত্যাদি।

সে দিনটার কথা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে গাঁথা আছে। পূর্ব্ব রাত্রে সত্যেনবাবু (৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), চারুবাবু প্রভৃতি এসেছিলেন। এঁরা আশ্রমের অধিকাংশ পর্ব্ব উপলক্ষেই কল্‌কাতা থেকে এসে যোগ দিতেন। ঊষার শুভ মুহূর্ত্তে পট্টবস্ত্র পরে আম্রকাননের মধ্যে কবি এসে দাঁড়ালেন। চারিদিক ধূনার গন্ধে আমোদিত হয়েছিল এবং কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার কুয়াসা দণ্ডায়মান কবির বরবপুকে আচ্ছন্ন করেছিল। সূর্য্যোদয়ের প্রথম কিরণ-সম্পাতের বহুপূর্ব্বে উন্মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ আম্রবীথিকার মধ্যে মুদিতচক্ষু দণ্ডায়মান কবি, আর তাঁকে বেষ্টন করে একান্ত শ্রদ্ধাবনত আশ্রমের আশ্রমচারিগণ—সমস্তটাকে রূপ দেবার ভাষা আমার নেই—কেবল এই বোধটুকু আমার চৈতন্যকে জড়িয়ে আছে যে আমি একটা খুব বড় জিনিষ সেদিন এই পোড়া চোখে

প্রত্যক্ষ করেছিলুম এবং তারই গৌরবময় স্মৃতি আজও বহন করে বেড়াচ্চি।

সেদিনের আর কোন খুঁটিনাটি ঘটনা আমার মনে পড়ে না—মনে থাক্‌বার বয়সও সেটা নয়। শুধু এইটুকু মনে আছে যে অজিতবাবু (৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ সেদিন সকালে পড়েছিলেন। সেই প্রবন্ধ ১৩১৮ সালের 'প্রবাসী'র আষাঢ় এবং শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয়। শাস্ত্রীমশায় (শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী) সেদিন কবিকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার খুব ঘটা ছিল।

আমার বোলপুর আশ্রমে ভর্ত্তি হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু আজ বলার কোন বাধা নেই—যাঁর জন্যে বল্‌তে পারতুম না তিনি স্বর্গীয় হয়েচেন। বাল্যকালে আমরা তিন বন্ধুতে মিলে ৩০শে আশ্বিন তারিখে রাখীবন্ধন করেছিলুম। তাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন হয়েছিল কি না জানা নেই কিন্তু আমাদের নামে রিপোর্ট হয়েছিল। কোন রায়সাহেব খেতাব-লুব্ধ ভদ্রলোক এই সৎকর্ম্মটি করেছিলেন। উপাধি তাঁর ভাগ্যে জোটে নি—কিন্তু আমাদের ভাগ্যে রাষ্টিকেসন জুটেছিল। এই ঘটনায় মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে আমি স্কুল ছাড়্‌তে বদ্ধপরিকর হই। রবীন্দ্রনাথের ষ্টেটে আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তাঁর ঘরে বসে খেয়াল হ'ল রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়। চেষ্টা করলুম কিন্তু দারওয়ানকে অতিক্রম করে তাঁর কাছ পর্য্যন্ত পৌছুঁতে পারলুম না। হতাশ হয়ে যেখানটায় বসেছিলুম দোতলার থেকে সে জায়গাটা দেখা যায়। রবিবাবু দোতলায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আমাকে দেখ্‌তে পেলেন এবং ডেকে পাঠালেন। তখন একসঙ্গে তিনজন দারওয়ান ছুটে এসেচে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম কথা কওয়ার স্মৃতি এখনো আমার মনে পড়ে। কথা শুনে মনে হয়েছিল—কি স্বর! এমন আওয়াজ ত কখনো শুনিনি! কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার কাকে বলে তা জানা ছিল না—কিন্তু সেদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন এসেচি। না ভেবে চিন্তেই উত্তর দিলুম—"বোলপুর যাব বলে।" আশ্চর্য্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তখুনি রাজি হয়ে বল্লেন—"বেশ, পরশু দুপুরের গাড়ীতে আমার সঙ্গে যেয়ো।" একেবারে বোলপুর পৌছে তারপর বাড়ীতে খবর দিলুম।

বোলপুর থাকার সময়টা তাঁর কাছে কাছেই থাক্‌তুম। কবিতা লিখে তাঁকে দেখাতুম—তিনি করেক্ট্‌ করে দিতেন। দুপুরবেলা শান্তিনিকেতনের দোতলায় জাজিমের উপর বসে শান্তিনিকেতন-সিরিজের থেকে প্রবন্ধ বুঝিয়ে নিতুম—কখনো

বিরক্ত হতে দেখিনি—এক কথা পাঁচবার বুঝিয়ে বল্‌তেন। ছুটির সময়ও বাড়ী না গিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতুম। একবারকার ছুটির ঘটনার সঙ্গে এই প্রবন্ধের যোগ আছে।

সেবার আমরা গরমের ছুটিতে পদ্মার ধারে শিলাইদা বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে ছিলেন দিনুবাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর), নগেনবাবু (নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আর সস্ত্রীক রথীবাবু (রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর)। শিলাইদার কুঠীবাড়ীতে আমাদের থাক্‌বার স্থান হ'ল। কবির জন্য তেতলার একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। একতলার একটি ঘরে আমি, আর একটি ঘরে দিনুবাবু স-এস্রাজ বিরাজ করতেন। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" তখন ছেপে বেরিয়ে গেছে। এই ছুটিতে কবি "জীবনস্মৃতি" এবং "অচলায়তন" একসঙ্গে লিখ্‌তে সুরু করেন। কবি সমস্ত দিন ধরে লিখ্‌তেন—সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়ে শোনাতেন। এটি কবির চিরকালের অভ্যাস। কুঠীবাড়ীর দোতলার সেই সান্ধ্য আসরগুলির কথা আমার খুব মনে আছে। তখন দূরের দেবালয়ের কাঁসরঘণ্টার শব্দ থেমে যেত—কুঠীবাড়ীর একপ্রান্তের ঝাউ গাছটা সোঁ সোঁ শব্দ করত—দূরের পদ্মার হাওয়া ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে ভেসে আস্‌ত—ঘরের মধ্যে আমরা পাঁচটি প্রাণী মুগ্ধচিত্তে কবির লেখা শুন্‌তুম।

এই ছুটিতে একদিন হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে কবির কাছে

আমি যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে পাচ্চি নে অর্থাৎ সন্ধ্যার সেই আসর এবং মাঝে মাঝে কবির খাবার থালা থেকে পরমান্নের বাটী পেয়েও আমার মন ভরত না। তাই কবির প্রতিদিনকার চিঠির ডাক যখন উপরে যাচ্ছিল তখন সেই সঙ্গে আমিও একখানা চিঠি লিখে উপরে পাঠিয়ে দিলুম। চিঠিখানির ভাবার্থ বোধ হয় এই ছিল যে অজিতবাবু যেমন আপনার সঙ্গে পদ্মার উপর বোটে বাস করেচেন সেই রকমই কিছু একটা আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছিলুম কিন্তু আপাতত সেটা কোন রকমেই হতে পারচে না ইত্যাদি। বেশ মনে আছে সেদিন কবি সন্ধ্যার আগেই নীচে নেমে এলেন এবং একতলার রকে একখানি আরাম-কেদারায় আসন গ্রহণ করলেন। তারপর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি পায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। তিনি আমার চিঠির কোন উল্লেখ করেন নি। যতদূর মনে পড়ে কথাও আমাদের বেশি হয় নি। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত ছিল। সন্ধ্যার পরেই গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল। সেই অন্ধকার ফিকে হয়ে দূরের সিমেণ্টওয়ালা চত্বরে যখন চাঁদের আলো পড়ল তখন অনেক রাত—কবি আসন ত্যাগ করে উঠ্‌লেন। সমস্ত অন্ধকার দিয়ে তাঁর সান্নিধ্য সেদিন অনুভব করেছিলুম।

পূর্ব্বেই বলেচি এই ছুটিতে কবি "জীবনস্মৃতি" আর "অচলায়তন" এক সঙ্গে লিখ্‌তে সুরু করেন। "অচলায়তনের"

প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'গুরু'। রবীন্দ্রনাথের কোন একখানা বই সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কিছু বল্‌তে যাওয়ার মধ্যে একটা ব্যর্থতা আছে, কেননা কবির সমস্ত লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর সমগ্র জীবনটাই বিকশিত হয়ে উঠেচে। এই বিকাশের ধারা অনুসরণ করতে হলে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" থেকে স্বুরু করে "শেষের কবিতা" পর্য্যন্ত আস্‌তে হয়—তবে এর প্রত্যেকটি স্তর চোখে পড়ে, কবির কাব্যরচনা যে জীবনরচনার অন্তর্গত তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি হয়। বিশ্বানুভূতি কবির কাব্যের এবং জীবনের মূল সুর—তারই ধারা দেশ, কাল এবং পাত্রের ভিতর দিয়ে বিচিত্র হয়ে তাঁর সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছে—কোন একটা বিশেষ কাব্যের মধ্যে তার সাময়িক চেহারাটা নজরে পড়্‌তে পারে মাত্র—তার ধারার ক্রমাভিব্যক্তির আলোচনা নিষ্ফল।

শাস্ত্রানুশাসনের বন্ধনে আমাদের দেশের এবং সমাজের মনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে কি রকম পঙ্গু করে দেওয়া হয়েচে 'অচলায়তনে' সেইটিই দেখানর প্রয়াস। এই অনভিপ্রেত পীড়নের কঠিন নাগপাশে জর্জ্জরিত হয়ে আমাদের মানবাত্মা অবিরত কাঁদ্‌চে—প্রতিমুহূর্ত্তে এরা মানুষের সনাতন নিত্যমুক্ত মনকে অপমান করচে—অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। চারিদিকে প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীর তুলে বিশ্বের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করেছিলুম—মনে হয়েছিল

এতেই বুঝি মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ। এখানে ভাবনা করবার কিছু নেই—আমাদের ভাবনা শাস্ত্র ভেবে রেখে গেছেন—আমাদের মনে যে সমস্যার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক তার সমাধানও শাস্ত্র পূর্ব্বে থেকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুতরাং এখানে আমরা পরম নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ। যা কিছু করি শাস্ত্রানুসারে করি—কি কাজ করে কি ফল পাব তাও আমাদের আগে থাকৃতেই জানা। এখানে আমাদের আশা করবার, আকাঙ্ক্ষা করবার কিছু নেই—এখানে পরম করণীয় হচ্চে চোখ কান মুখ বুঁজে সব মেনে নেওয়া এবং গতানুগতিক স্রোতে ভেসে চলা। কিন্তু এই সযত্নরচিত ব্যবস্থাটি চিরন্তন হ'তে পারত যদি মানুষের মন চৈতন্যস্বরূপ না হয়ে জড় হ'ত। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-বিধাতা—সে ভয় করবে, ভাবনা করবে, পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে ভুল করবে এবং ভুল করতে করতে পথ খুঁজে পাবে—এই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। রচিত পথে পা তুলে দিয়ে পিছন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়া হবে এবং সে সেই ধাক্কার চোটে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চল্‌বে, না এ মানব-ধর্ম্ম, না এতে গৌরব করবার কিছু আছে।

শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অচলায়তনের হাওয়াকে পরিপূরিত করেছিলুম—সেখানে অন্য হাওয়ার প্রবেশ নিষেধ ছিল। মনে হয়েছিল এতেই বুঝি এখানকার হাওয়া বিশুদ্ধ থাকৃবে। এটা

মনে হয় নি যে সত্যকে এ রকম করে সঙ্গোপনে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না—সে নিজের তেজে নিজে বাঁচে। বিশ্বের সর্ব্বব্যাপী হাওয়ার অবাধ সংস্পর্শেই বদ্ধ হাওয়ার মুক্তি—নচেৎ কলুষিত হয়ে সে প্রাণঘাতী হয়।

অচলায়তনের ঐ সনাতন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারত যদি সেখানে পঞ্চকের মত ছাত্র নবীন প্রাণ নিয়ে উপস্থিত না হত। পঞ্চকের প্রাণ বিশ্বের নবীনতার হিল্লোলে স্পন্দিত—শাস্ত্রাচারের নিষ্পেষণে সে প্রাণ মরবার নয়। তাই মহাপঞ্চকের ন্যায় মহাজ্ঞানীর ভাই হয়েও সে শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটা মুখস্থ করতে পারলে না—বোধস্থ করা ত দূরের কথা। অথচ তার চেয়েও বয়সে ছোট সুভদ্রের মনে এই চিরাচরিত প্রথার সংস্কার কি রকম দৃঢ়ভাবে কামড়ে ছিল। এই রকমই হয়। ক্বচিৎ দু' একজন এমন লোক জন্মান যাদের মন দূরের সুরে বাঁধা —ক্ষুদ্রতা এবং অসত্য কোন রকমেই তাঁদের মনকে বাঁধতে পারে না।

এই মিথ্যা আচারের পুঞ্জীভূত গ্লানি যেদিন আকাশব্যাপী হয়ে ওঠে সেদিন প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়—এই মিথ্যাকে পদদলিত করতে গুরুর আবির্ভাব হয়। অচলায়তনের গুরুও একদিন রুদ্রবেশে এসে দেখা দিলেন। আয়তনের উঁচু প্রাচীর চুরমার করে মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

পাঁচ-মিশেলি

নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে চারটি দেওয়ালের ভিতর বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সার্থকতা নেই—উন্মুক্ত বিশ্বের খোলা রাজপথ দিয়েই যে বিশ্বের প্রভুর আসা-যাওয়া !

সত্যের পথ চিরকালই সহজ এবং সরল—মন্ত্রের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে সে পথের সন্ধান মেলে না। দর্ভকপাড়ায় সরল বিশ্বাসে নামগানের মধ্যে সত্যের সহজ রূপ আছে—শোনপাংশুদের প্রীতি এবং ভালবাসার মধ্যেও সত্যের সহজ রূপ বিদ্যমান।

কোন্ এক আদিম প্রাতে আমাদের গুরু আমাদের একটি সত্য বস্তু দান করে অন্তর্হিত হয়েছিলেন—এতদিন ধরে কেবলি ভেবে আস্‌চি আমরা বোধ হয় সে বস্তু হারাই নি—বোধ হয় আমরা এগিয়েই চলেচি। হঠাৎ কোন ঘটনার অপ্রত্যাশিত আঘাত উপস্থিত হ'য়ে সে বস্তুর যাচাই আরম্ভ হয়। তখন বিস্মিত হ'য়ে দেখি আমরা একটুকুও এগুই নি—কেবল এক বস্তুকেই পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করে ঘুরেচি। পঞ্চককে পেয়ে আচার্য্য অদীনপুণ্যের এইটি হয়েছিল। তিনি একমুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পার্‌লেন—ভুল, ভুল, এতদিন যা' করেচি সব একেবারে ভুল—এতদিন যার পূজা করেচি সে তার কঙ্কাল। তাঁর ভিতর এই সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি বরাবরই ছিল। কিন্তু মহাপঞ্চকের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার চেয়ে মূঢ়তা ছিল শতগুণ। তাই তিনি সত্যের সাম্‌নে এসেও তার প্রতি বিমুখ হয়ে রইলেন

রবীন্দ্রনাথ ও অচলায়তন

কিন্তু আর না। ব্যাপার ক্রমশঃ ঘোরালো করে তুলেচি। এইবার সময় থাকৃতে বিদায় নেব। একটা কথা বলে রাখি—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে যে সব ঘটনা উদ্ধৃত করেচি তার একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর শিশুসুলভ কবি-প্রকৃতিটিকে চিনিয়ে দেওয়া। অবশ্য আমাকে অবলম্বন করে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার জন্যে আমারও গৌরব কম নয়।*

২৫ শে বৈশাখ ১৩৩৬

ফাল্গুনী

ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিন দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের নাট্যকলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাট্য-কাব্য অভিনীত হয়েচে।

বাংলার বাইরে, এমন কি বাংলাদেশেও ফাল্গুনী কোথাও অভিনীত হয়েচে বলে আমার জানা নেই। এক রবীন্দ্রনাথ নিজেই ফাল্গুনী বোলপুরে এবং কলকাতায় অভিনয় করেছিলেন। একে ত রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন লেখার যে অভিনয় হতে পারে এ কথা সাধারণে বলে না তার উপর ফাল্গুনী আবার সবার সেরা — রূপকের চরম। সুতরাং এঁদের এ নির্ব্বাচণে সাধারণে যে খুসী হবেন না এবং একে সুবুদ্ধির কাজ বলে মনে করবেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করতে হবে। রুচিরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির স্তর আছে। আমাদের দেশে এমন সময় ছিল যখন যাত্রার দলে গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোকের পার্ট অভিনয় ক'রে লোকে বাহবা নিত। ক্রমশঃ থিয়েটারের যুগে রুচির আর একটু উন্নতি হ'ল। তখন লোকে চোখের ও কানের খোরাক

ছাড়া মনের খোরাকেরও খোঁজ করতে লাগ্‌ল। বর্ত্তমান রবীন্দ্র-সাহিত্যে আবার আত্মার খোরাকের কাজ চল্‌চে। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের এই আত্মা প্রভৃতি বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ নেই। লঘু সাহিত্য এখানে বেশী আদরণীয়। আজও আমাদের দেশ তলোয়ারের আস্ফালন এবং বীররসের মোহ কাটাতে পারে নি। সূক্ষ্মের চেয়ে স্থূলের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশী। তাই আমার মনে হয় দিল্লীর বর্ত্তমান নাট্য-কলাবিভাগের নেতৃবৃন্দ ফাল্গুনীর মত বই নির্ব্বাচণ করে যে সুরুচির পরিচয় দিয়েচেন, তা' সর্ব্বজনপ্রিয় না হলেও অনন্যসাধারণ। বাংলার বাইরে বাঙ্গালীরা যে প্রবাসজীবন যাপন করেন, সেখানে তাঁরা যে শুধু ডাক্তারি, ওকালতি, ব্যবসা ছাড়াও অন্য বিষয় চিন্তা করে থাকেন, এটা আশারই কথা বল্‌তে হবে।

কি প্রাণপাত পরিশ্রম করে যে এঁদের এটিকে সার্থক করে তুল্‌তে হয়েছিল তার সামান্য ইতিহাস আমি জানি। দিল্লী থেকে মন্মথ বাবুকে পাঠান হ'ল বোলপুরে গানের সুরগুলি আদায় করে আন্‌তে। রবীন্দ্রনাথের চরণোপান্তে উপস্থিত হলে তিনি সব শুনে বল্লেন, "তুই দু'দিনের মধ্যে ফাল্গুনীকে দিল্লীতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাস ?" তিনি যে প্রবাসী বাঙালীদের কাছ থেকে এতদিন কোন সাড়াই পান নি এটি বোধ হয় তারই আভাস। তারপর দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুরগুলি আয়ত্ত করে তিনি

ফিরে এলেন। মাঝির কুটীরের দৃশ্যে সারদা বাবু বল্লেন, কুটীরের উপর দিয়ে একটু বাঁকা ছোট একখানি ডাল থাকবে। ইঞ্জিনীয়ার নৃত্যগোপাল বাবু তিন দিন মাঠে মাঠে ঘুরে ঠিক সেই রকম একটী ডাল আহরণ কল্লেন। আর ফুল ঝোপঝাড় গাছপাতা ত সমস্ত দিল্লী সহর ঝেঁটিয়ে, এমন কি আম্বালা থেকেও আনা হয়েছিল। যেখানে যেটুকু হলে ideal-এর কাছাকাছি পৌঁছানো যায় বলে এঁদের মনে হয়েচে, তার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি এঁরা করেন নি। বাইরে থেকে এইটুকু জেনেই এঁদের প্রেরণার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

অভিনয় সম্বন্ধে বলার কথা এই যে অ্যামেচার অভিনয়ের যে সব সাধারণ খুঁত হয় তা' এঁদের হয়েছিল। প্রত্যেক অঙ্কের মধ্যে প্রচ্ছদপট উঠ্‌তে বড় বিলম্ব হচ্ছিল এবং সে জন্যে দর্শকবৃন্দ অধীর হচ্ছিলেন। কিন্তু ভিতরের লোকদের তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রত্যেক দৃশ্যে সীন আগাগোড়া বদল করতে হয়েচে। সেজন্যে কতকটা বিলম্ব অপরিহার্য্য। আর এগুলি details-এর খুঁত, principle-এর নয়। এঁদের সার্থকতা সেইখানে যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের কচি কচি হাত দু'খানি নেড়ে নেড়ে গেয়েছিল, "দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।" যদি সেদিন কারোর প্রাণ এই দোলায় দুলে থাকে, যদি তিনি অনুভব করে থাকেন যে বাংলার বাইরে

অর্থাৎ যে বয়সে মানব-মনের রসের উৎস একেবারে শুকিয়েও যায় না, আবার বিচারবুদ্ধিরও অপ্রতুলতা ঘটে না। কিন্তু আমার বন্ধুর প্রবন্ধ শুনে আমার সে ধারণা উল্টে গেছে এবং তার জায়গায় অপর একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। সেটি হচ্চে এই যে বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক মনোভাব অত্যন্ত একপেশে। সংস্কারহীন এবং উদার যে মনোভাবের প্রসাদে এই সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হ'তে পারে আমাদের সমাজে তার একান্ত অভাব।

বন্ধু উপরের কয়েক ছত্রে যে প্রশ্ন তুলেচেন তার বিচার করতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষীয় বিবাহের রীতি এবং নীতির গোড়ার কথা থেকে সুরু করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে আমাদের দেশে পাঁচ রকম বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে—গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ এবং ব্রাহ্ম। মনু তাঁর শাস্ত্রবিধির মধ্যে সবগুলিকেই স্থান দিতে বাধ্য হ'য়েচেন। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার নাম আসুর বিবাহ। তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা অথবা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহ হওয়ার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আর ব্রাহ্ম বিবাহ মানে হচ্চে সেই ধরণের বিবাহ যা আমরা সদাসর্ব্বদা চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্চি, যাতে কন্যাকে বর প্রার্থনা করবে না, অযাচক বরকে কন্যাদান

করতে হবে। সম্প্রতি আমাদের হিন্দুসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহ চলিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তার কারণ হ'চ্চে এই যে অন্যান্য বিবাহপদ্ধতিগুলির মধ্যে সামাজিক কোন নিবিড় অভিপ্রায় নেই —যা' আছে তা' হ'চ্চে অর্থবল, বাহুবল, না হয় ত রিপুর বল। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রে ওগুলিকে অগত্যা স্বীকার করেও নিন্দা করা হ'য়েচে—সুতরাং সামাজিক জীবনে ওগুলি যথাসাধ্য পরিত্যক্ত হ'য়েচে। মনু গান্ধর্ব্ব বিবাহকেও কামসম্ভব ব'লে একটু খোঁটা দিয়েচেন।

ভারতবর্ষীয় বিবাহপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তার সামাজিক কি অভিপ্রায় ব্যক্ত হ'চ্চে বুঝ্‌তে হ'লে আমাদের সমাজ-জীবনের তথা ভারতীয় সভ্যতার ভিতরকার তত্ত্বটি বোঝা চাই। ভারতীয় সভ্যতার ধারা হ'চ্চে নিবৃত্তিমূলক—এখানে প্রবৃত্তির জয় গাইবার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং যে দেশে ত্যাগ এবং নিবৃত্তির চর্চ্চা হ'য়ে থাকে, সে দেশে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ। এই গৃহকে গৃহাশ্রম নাম দিয়ে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হ'য়েচে, এবং যারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় মনুর মতে তারা এই আশ্রমের অযোগ্য। সুতরাং হিন্দু স্ত্রী প্রেয়সী নয়, গৃহিণী—যৌথ পরিবারের অঙ্গবিশেষ। এই পরিবারে স্ত্রীপুরুষের প্রেম ব'লে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে তাকে অতিক্রম ক'রে দাম্পত্য প্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে গ'ড়ে তোল্‌বার সাধনা ছিল।

কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখা চাই যে এদেশ গৃহকেও চরম ব'লে স্বীকার করেনি—এখানকার গৃহাশ্রম বাণপ্রস্থের পূর্ব্বাশ্রম মাত্র। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে ত্যাগ করতে হবে, এই ছিল ভারতসমাজের উপদেশ। এবং উক্ত আদর্শকে সম্ভব ক'রে তোল্‌বার জন্যে আমাদের দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। যে ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটায়, তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভাল। বিবাহের পূর্ব্বেও নানা কথাকাহিনী ব্রতপূজার মধ্যে দিয়ে তাদের মনকে এই আদর্শের উপযোগী ক'রে গড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে স্বামী তাদের পক্ষে একটা আইডিয়া—যতটা তাদের নিজের মনের জিনিস, ততটা বাইরের জিনিস নয়। সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা আছে তাতেও এই উদ্দেশ্য পরিপুষ্টি লাভ করে।

এই রকম ক'রে আমাদের যে সমাজ গড়ে উঠেচে সে যে আদৌ চলিষ্ণু নয় এ কথা বলা বাহুল্য। এ সমাজের স্থিতির দিকেই লক্ষ্য, গতির দিকে নয়। তাই মন্দিরের মত জরাজীর্ণ আচার-অনুষ্ঠান আঁকড়ে স্থাবর হ'য়েই সে রইল, বৃক্ষের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে আলো-বাতাস সে গ্রহণ করতে পারলে

না। এই রকম ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-সৌধের একখানি ইঁট নড়তে দিলেও ক্ষতি। তাই এখানে সতর্কতার অন্ত নেই—চলা-ফেরা সম্বন্ধেও তার এত সাবধানতার বাণী। বিবাহ সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে খাতির করে না—ভয় করে, তাই প্রাণপণে দাবিয়ে রাখতে চায়। কেন না আচারই তার বাহন, বিচার নয়। সমুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছদেশে বাস এককালে সমাজে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় ছিল। এপারের যাত্রীদের না হয় কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু ওপারের যাত্রীরা যখন হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, তখন সাগরপারের নতুন মত, নতুন শিক্ষা, নতুন অভ্যাস এপারে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করলে। কিন্তু তবুও প্রাচীন বিবাহ ব্যবস্থার সনাতন পদ্ধতি থেকে সমাজ এক-চুল স'রে দাঁড়াতে রাজি হ'ল না। এইখানে এখনো সে নির্ম্মম—এইখানে আঘাত পড়লে একেবারে তার ভিতে গিয়ে ঘা লাগে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে আমাদের চিন্তার ধারায় এবং ততোধিক জীবনযাত্রার প্রণালীতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটেচে। প্রথম কথা, আমাদের সমাজের যে নিশ্চলতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেচি সেটি হ'চ্চে সমস্ত প্রাণশক্তির প্রতিকূল, মানব-ধর্ম্মের বিরোধী। নিবৃত্তিমার্গের কথা আগে যা' বলেচি তা' হ'চ্চে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—সমাজজীবনে সকলেই ব্রাহ্মণ নয়। যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা নব নব ক্ষেত্রে আপন চঞ্চল শক্তির সাধনা করতে ছোটেন—

গার্হস্থ্যনীতির জটিল বেড়াজালে তাঁদের বেঁধে রাখা অসম্ভব। ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন ছিল রক্তবস্ত্র—সেটা বিদ্রোহের প্রতীক—তাই ক্ষত্রিয়ের দ্বারাই পুরাকালে যত কিছু বিপ্লব ঘটেচে। ভারত-ইতিহাসে এর উদাহরণ বিরল নয়। ভরতজন্মের আখ্যান-মূলক ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের নায়ক দুষ্মন্তই বলুন, আর বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণই বলুন, সবাই ছিলেন ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান কালে যে ব্রহ্মণ্যশক্তির বিশেষ অপহ্নব ঘটেচে একথা জান্‌তে আর কারো বাকী নেই। আর ক্ষত্রিয়েরা যে নিবৃত্তিমার্গী নয় একথা সেদিন উপেনবাবু তাঁর অভিভাষণে বলেচেন।

ইউরোপীয় সমাজের মূলপ্রকৃতি যেমন রাষ্ট্রিক, আর্থিক আমাদের সমাজের মূলপ্রকৃতি তেমনি সাম্প্রদায়িক—অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। বর্ত্তমান জীবনে এই প্রকৃতির সম্পূর্ণ বদল হ’য়েচে। ব্রাহ্মণ তাঁর আচারধারাকে রক্ষা করতে পারচেন না প্রতিদিন চোখের সাম্‌নে দেখা যাচ্চে—এমনি সব শ্রেণীরই দশা। আগে সমাজের যে উপাদান ছিল গৃহ, এখন সেখানে ব্যক্তি চেপে বসেচে। তার কারণ পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা ভারতের উপকূলে আছ্‌ড়ে পড়েছে এবং পড়ছে—চোখ বন্ধ ক’রে অথবা কানে তুলো গুঁজে তাকে ঠেকাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ অর্থকৃচ্ছ্রতার যুগে গৃহাশ্রমের সে বিশেষত্ব আর নেই।

অন্ন-সচ্ছলতা না থাক্‌লে বহুল-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনো পালিত হ'তে পারে না। ফলে গৃহাশ্রমের পরিধি এখন সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীতে এসে দাঁড়িয়েচে। আরো সর্ব্বনাশের কথা হ'য়েচে এই যে আমরা অধিকাংশ লোকই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দূরে বাস করচি—এখানে সমাজের বাঁধন অত্যন্ত আল্‌গা, সমাজকে তার প্রাপ্য দিতে লোকে কড়াকড়ি করচে, উপরন্তু সবলেন্দ্রিয় দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সকলেই নির্ব্বিচারে গৃহাশ্রমের পক্ষপাতী। গৃহী আর এখন তপস্বী নেই, অপরপক্ষে কোন বড় তপস্যা জীবনে গ্রহণ করতে গেলেই গৃহত্যাগের ব্যবস্থা হ'য়েচে। মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার পথ আইন দ্বারা রুদ্ধ হ'য়েচে। ব্রত, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে স্বামিত্বকে আইডিয়া ক'রে গড়ে তোল্‌বার উপযোগী আবহাওয়ার অভাব হ'য়েচে। সতীত্বকে সংস্কার ব'লে উল্লেখ করতেও দেখা যাচ্চে। এ সমস্তই আমাদের পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার ফল,—অথচ সমাজের কাঠামো এখনো বদ্‌লে যেতে পারে নি। সেইজন্যে আজকাল সমাজের সমস্ত বাধাকেই আমরা বহন করচি, অথচ তার লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারচি নে। যে গৃহ ছিল একদিন আশ্রম, আজ সে গর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েচে।

বিবাহ-সমস্যা ও "দেবদাস"

সমাজের উপাদান যখন ছিল গৃহ তখন নারীকে গৃহিণীর রূপ দিতে আমাদের বাধেনি, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে তার প্রেয়সীরূপই একান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। বন্ধু যে free loveএর কথা তুলেচেন, তাকে সমাজ-জীবন থেকে নির্ব্বাসিত করতে হ'লে সমাজ নিরাপদ হয় সত্য, কিন্তু নিঃসম্পদও হয়। নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখেচন, সেই বিচ্ছেদের আকাশে একটি প্রবল শক্তি সর্ব্বদা বিচিত্র আকর্ষণলীলায় প্রবৃত্ত। পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের যে প্রভাব আমাদের দেশ তার নাম দিয়েচে শক্তি। এ শক্তি সংহারও করে, সৃষ্টিও করে। সমাজে এ শক্তির অভাব ঘট্‌লে তার সৃষ্টিক্রিয়ার নির্জ্জীবতা ঘটে, মানুষ এ অবস্থায় নিস্তেজের মত গতানুগতিক হ'য়ে চলে। আমাদের সমাজের আজ সেই অবস্থা হ'য়েচে। অচল স্থিতিকে সে চেয়েছিল ব'লে সর্ব্বপ্রকার সক্রিয় শক্তিকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল—আজ জেগে দেখ্‌চে বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেচে।

আরো একটা কথা। হৃদয়বৃত্তির আনুষঙ্গিক উৎপন্ন একটা জিনিষ আছে যার নাম হ'চ্চে মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য আলোর মত, এ একটি শক্তি। আমাদের সমাজে প্রেমের চাষ ক'রবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে এ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ হয় না। অথচ পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে

সক্রিয় না করলে সে আপন পূর্ণফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য্য, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে। আনন্দলহরী নামে একখানি কাব্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত। বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেচেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানব-সমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। অথচ আমরা এই শক্তিকে চিরকাল বাইরে ঠেলে রাখলুম—ভিতরে আমল দিলুম না। নারীর এই মাধুর্য্য যে বিলাসসামগ্রী নয়, সে যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ এ কথা বোঝবার বয়স আজো আমাদের সমাজের হ'ল না —আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তিহীনতার এ-ও একটা প্রধান কারণ।

শুন্‌তে পাই বঙ্কিম বাবু লিখে গেছেন যে বাল্যপ্রেমের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত আছে। অন্যদেশে আছে কিনা জানিনে কিন্তু আমাদের দেশে যে আছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এর কারণ ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করবার প্রবৃত্তি। আমাদের সামাজিক আইন-কানুন এমনি বিচিত্র এবং তার দংষ্ট্রা এতই দূরবিস্তৃত যে কোন হৃদয়বৃত্তিকে অভিসম্পাত ক'রে তুল্‌তে আমাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আপাতত এই সম্পর্কে আমার "দেবদাসে"র কথা মনে পড়চে। শরৎ বাবুর এ উপন্যাস আপনারা সকলেই প'ড়ে থাকবেন। ছোট বেলা থেকেই দেব-

দাসের একমাত্র সঙ্গী ছিল পার্ব্বতী। খেলা-ধূলা, দুষ্টুমি প্রভৃতি সব কাজেই পার্ব্বতী ছিল তার সহায়, এবং এই সব চিরন্তন তুচ্ছতার ভিতর দিয়েই প্রেমের দেবতা তাঁর আসনখানি তাদের হৃদয়পটে বিছিয়েছিলেন। অন্য কোন সমাজ এই মধুর সম্বন্ধটিকে কোনক্রমেই বাধাগ্রস্ত করতে চাইত না—বরং এর শক্তির দ্বারা সমাজ-জীবনকে লাভবান ক'রে তুল্‌ত। কিন্তু আমাদের সমাজ তর্জ্জনী তুলে বল্লে, 'খবরদার, বেচাকেনা ঘরের মেয়ের সঙ্গে জমিদারের ঘরের ছেলের বিয়ে হয় না।' পরস্পরের এতদিনের সম্বন্ধ এক ফুৎকারে উড়ে গেল, সমাজের বাধাই বড় হ'য়ে রইল। এ বাধা দেবদাসের জীবনের উপর যে কি ফল প্রসব করতে পারে তা' সমাজ একবারও ভেবে দেখার দরকার মনে করলে না, প্রেমের নির্য্যাতনে এমনি এর ক্রূর আনন্দ! তারপর চলচ্চিত্ত দেবদাস যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গেল, তখন সমাজ আবার তর্জ্জনী তুলে বল্লে, 'লোকটা কি মন্দ, কি দুর্নীতি-পরায়ণ!'

মানব-মনের সাম্‌নে আজ এই প্রশ্ন উদিত হয়েচে যে দেবদাসের অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? সে যে কোন মতেই অধম হ'য়ে জন্মায় নি, গল্পে সে প্রমাণের অভাব নেই। পিতাকে সে ভক্তি করত—মৃত্যুর পর বাহ্য শোক প্রকাশ না ক'রে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে পড়েছিল; তাঁর শ্রাদ্ধে নিজের অংশের বহু অর্থ ব্যয় করেছিল। মাতৃভক্তি যে তার কত অসীম ছিল তা' এ আখ্যায়িকা

একটু প্রাণ দিয়ে পড়লেই ধরা যায়। পরপারের ডাক যখন এসে পৌঁছুল তখন মায়ের পদপ্রান্তে গিয়ে আছড়ে পড়ার জন্যে কি সে মর্ম্মন্তুদ আকুলি-বিকুলি—অথচ নিজের মসীলিপ্ত কালিমামাখা মুখখানা কিছুতেই মায়ের সাম্‌নে দেখানর স্পর্দ্ধা সে করতে পারলে না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, দেবদাস পিতৃমাতৃভক্ত না হ'লে এই গল্পটির এ রকম পরিণতি হ'তে পারত না। বড় ভাই দ্বিজদাসের মত সে না ছিল অর্থগৃধ্নু, না ছিল কপটাচারী। অথচ এই দ্বিজদাসই তার হাজার রকমের নীচতা নিয়ে সমাজের মাথার মণি হয়ে রইল, দেবদাস তার হাজার রকমের উদারতা নিয়ে একেবারে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। অত্যাচার সে করেছিল এ কথা অস্বীকার করচি নে—কর্ম্মফলের ন্যায়বিধানে তার পুরা ফল সে পেয়েছে। বারে বারে ভুগেছে, কুৎসিত রোগাক্রান্ত হ'য়েছে, শেষকালে মৃত্যু হ'ল তার এমন এক সময় যখন তার কাছে না ছিল একজন বন্ধু, না ছিল একজন পরিজন। মৃত্যুর পর চাঁড়ালে তাকে বেঁধে নিয়ে গেল এবং কোন্ পুষ্করিণীর কোন্ তীরে তাকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে এল ইতিহাস তার খবর রাখলে না। এর চেয়ে বেশী শাস্তি আমাদের সমাজবিদ্‌গণ নিশ্চয়ই তাকে দিতে চাইতেন না।

কিন্তু মানব-মনের রুদ্ধ দুয়ারে একটা প্রশ্ন এই ব'লে অবিরত মাথা খুঁড়ে মরচে যে দেবদাস যেমন কর্ম্ম করেছিল তেমনি ফল পেয়েছে, এই কি এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর? কে তাকে এই

পথের পথিক হওয়ার উপকরণ জুগিয়েছিল? কে তাকে তার সকল সার্থকতার পথ থেকে ছিনিয়ে এনে কর্ণধারবিহীন নৌকার মত গভীর তুফানে ছেড়ে দিয়েছিল? কি সে তার অপরিসীম ব্যথা যার সর্ব্বনেশে জ্বালা জুড়ুতে তাকে সুরার আশ্রয় নিতে হয়েছিল? সমাজের কেবল কি বেদনা দেবারই অধিকার, ব্যথা বোঝ্‌বার দায়িত্ব নেই? জৈবধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে মানবধর্ম্মের লড়াই বেধেছিল সেখানে দেবদাস জৈবধর্ম্মের কাছে পরাস্ত হয়েচে মানি, কিন্তু তবু ত তাকে ছোট মানুষ ভাব্‌তে পারি নে। মদ খেয়ে নিজের মানবত্বকে বিলুপ্ত ক'রে না দিয়ে যে ব্যক্তি বেশ্যার হাতে আত্মসমর্পণ করতে পারত না, সে কি মানুষ হিসাবে এতই ঘৃণ্য?

তাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম, "দেবদাসের" মধ্যে সব চেয়ে বড় চরিত্রই হচ্চে দেবদাস। নীতিবিদ্‌ বন্ধু নাক সিঁট্‌কে বলেছিলেন, না, "দেবদাসে"র মধ্যে বড় চরিত্র হচ্চে চন্দ্রমুখী—সে যে পরশমণির জোরে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে নিবৃত্তির পথে এল সেইটি দেখানই হচ্চে "দেবদাসে"র বড় কথা। হতেও পারে, কিন্তু আমার কেবল এই কথাটি মনে হয় যে দেবদাসের ভিতর দিয়ে শরৎ বাবু আমাদের এক দিক্‌কার দৃষ্টি খুলে দিয়েচেন। নীতিসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের মন এতকাল দুর্নীতিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি দিয়েই বিচার ক'রে এসেচে কিন্তু দুর্নীতিরও যে একটা পূর্ব্বেতিহাস থাক্‌তে পারে এবং সে ইতিহাস যে অত্যন্ত করুণ হ'তে

পারে দেবদাসকে দিয়ে সেইটিই প্রমাণ হ'য়ে গেল। To know all is to pardon all—ইংরাজি এ প্রবাদবাক্যও কি সত্য নয়?

পার্ব্বতীকে নিয়ে এইবার হয় ত ঝগড়া বাধ্‌বে। তাকে সতীসাধ্বী বল্‌তে অনেকের আপত্তি হবে। সমাজের ব্যবস্থা মাথা পেতে নিয়ে সে শ্বশুরঘর করতে গিয়েছিল কিন্তু তার মনের অসীম রাজত্বে দেবদাসই যে চিরকাল একাধিপত্য করেচে এ কথা কারুরই অগোচর নেই। পার্ব্বতীর জীবনে তালসোনাপুরই সত্য কি হাতীপোতাই সত্য, দেবদাসই সত্য কি ভুবন চৌধুরী সত্য, মনই সত্য কি দেহ সত্য, এ প্রশ্নের মীমাংসা জগদীশ্বরের দরবারে এখনো পেশ করা আছে—আমরা কেবল এইটুকু জানি যে মানুষ এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে নি।

* * * * * *

Elixir of life ব'লে কোন বস্তু আবিষ্কার হয়েচে কি না আমার জানা নেই। মানুষ চিরকালই আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির তারতম্য হিসাবে এই সন্ধানের পথ প্রতি মানুষেরই বিভিন্ন। লালা বাবু একদিন এক কথায় রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে আনন্দের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন। যতীন দাস সেদিন যে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিল তার মধ্যে সে তার অমৃতরূপ দেখেচে। দেবদাসও যে সুবিপুল বেদনার অনলে ধূপের মত নিজেকে নিঃশেষে উৎসৃষ্ট করেছিল সেও এই চিরন্তন

অর্দ্ধজ্ঞাত আনন্দের অভিসারে। মানুষের এ যাত্রাপথ এখনও শেষ হয় নি—লীলাময়ের এ অনন্ত লীলা চলেইচে। তাই এ পথবাহীদের কে ছোট কে বড় তার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হ'তে পারল না!

* কোন সমাজই এখন পর্য্যন্ত বিবাহ-সমস্যার নির্দ্দোষ সমাধান করতে পারে নি। মানুষের চরিত্রে এখনো প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব সমান চলেচে। অতএব প্রতীচ্যের সমাজবিধিই শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণকর—এ কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অপরপক্ষে আমাদের সমাজে পূর্ব্বতন আদর্শের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার যে একটি স্বতঃবিরোধ জন্মেচে সেইটির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করাই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়। *

* বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে এই প্রবন্ধের উপকরণ গৃহীত হ'য়েচে।

প্রতাপ ও দেবদাস

"বিবাহ-সমস্যা ও দেবদাস" ব'লে আমি একটি প্রবন্ধ লিখে ছিলুম। সেটি যখন স্থানীয় সাহিত্য-সভায় পড়া হয় তখন প্রবন্ধ শোনার পর আমার এক অধ্যাপক-বন্ধু আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বলেন যে আমি দেবদাসের চরিত্রের মাত্র একটি দিক দেখিয়েছি অর্থাৎ দেবদাসের প্রতি সহানুভূতিই আমার প্রবল—তার ফলে তার নৈতিক অবনতির দিকটা আমার লেখায় ফুটে ওঠেনি অথবা তার নৈতিক অবনতি ব্যাপারটা আমি খুব বড় ব'লে মনের মধ্যে স্থান দিই নি।

বন্ধুর অভিযোগ ঝেড়ে ফেল্‌তে পারলুম না। মনের মধ্যে অবিরত জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লুম, আচ্ছা, এই যে দেবদাসের এই রকম শোচনীয় অধঃপতন হ'ল, কিসের ফলে হ'ল? কি সে বস্তু যার অভাবে তার সমস্ত কর্ম্মোদ্যম একেবারে পঙ্গু হ'য়ে গেল,—তার কর্ণধারবিহীন নৌকা চোরাবালির কবলে প'ড়ে একেবারে আঘাটায় আছাড় খেলে?

একটু হদিশ পাওয়ার আশায় আমার অন্য এক অধ্যাপক-

প্রতাপ ও দেবদাস

বন্ধুর সঙ্গে একদিন এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলুম। আমাদের প্রশ্নোত্তরমালাটা এই রকম ঃ—

'দেবদাসের অধঃপতনের জন্যে আপনি তাকে দোষী মনে করেন?'

বন্ধু একটু সাবধান হ'য়ে উত্তর দিলেন; বল্লেন, 'দেবদাসের প্রেমের নিষ্ঠাকে প্রশংসা করি, সে খুব ঘা খেয়েছে একথাও স্বীকার করি, কিন্তু তার অধঃপথে নেমে যাওয়াটা আদৌ সমর্থন করি নে। তার জন্যে আমার মনের মধ্যে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, সহানুভূতি আছে কিন্তু শ্রদ্ধা নেই।'

এই বন্ধুটি আইডিয়ার রাজ্যে ultra-modern ব'লে খ্যাত। সুতরাং তাঁর উত্তর শুনে ভাবনা বেড়েই গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, দেবদাস পরবর্ত্তী জীবনে কি করতে পারত, একটা আন্দাজ করুন ত, —তার জন্যে একটা alternative জীবনযাত্রার পথ কল্পনা করুন।'

বন্ধু কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বল্লেন, 'কেন, সে বড় অধ্যাপক হ'য়ে পড়াশুনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সব ভুল্‌তে চেষ্টা করতে পারত; না হয় ত দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারত—কত পথ তার জন্যে খোলা ছিল। তা না ক'রে সে আব্‌দেরে ছেলের মত না-পাওয়ার দুঃখে কান্না

জুড়ে দিলে, তারপর নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌লে। আপনি যা'ই বলুন, এ কিন্তু তার নিছক দুর্ব্বলতা—এর স্বপক্ষে বলার কিছু নেই।'

স্বপক্ষে বলার ত কিছু নেই জানি, কিন্তু জগতের মতে মত দিতেও আমার যেন কোথায় বাধ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল কি যেন একটা element আমরা হিসাবের মধ্যে আন্‌চি নে—তাই যত গোল বাধ্‌চে—দেবদাসের পরিপূর্ণ বিচার হ'চ্চে না। কি সে বস্তু যা আমাদের মানসিক চিন্তার হাতকে elude করচে, সন্ধান করতে লাগলুম। সুতরাং দেবদাসের আখ্যায়িকা আবার গোড়া থেকে বুঝে দেখার চেষ্টা করতে হ'ল।

দেবদাসের কাহিনী সংক্ষেপে এই ঃ—দেবদাস বড়লোকের দুরন্ত ছেলে—পড়াশুনার প্রতি গোড়া থেকেই তার দারুণ বৈরাগ্য। ভাল লাগ্‌ত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান, ঘুড়ি উড়ান, পাড়াময় উপদ্রব ক'রে বেড়ান প্রভৃতি ধরণের স্বাধীন আনন্দ। এই আনন্দে একমাত্র সঙ্গী জুটেছিল পাশের বাড়ীর মেয়ে পার্ব্বতী। দেবদাস পাঠশালা ত্যাগ কর্‌লে—পার্ব্বতীও আর পাঠশালায় পড়তে গেল না। সমস্ত দিন দুজনে দুজনের সহচর। দেবদাসের মেজাজ-অনুসারে কখন আদর, কখন মারধোর খাওয়া ছিল পার্ব্বতীর নিত্য পাওনা। এই রকম ক'রে তালসোনাপুরের ক্ষুদ্র প্রান্তে তাদের যে সংসার, সেখানে দুজনে দুজনের কাছে একান্ত। ভবিষ্যতের কোন ভাবনা না ভেবে দু'টি অসামাজিক মন

পরস্পরকে জড়িয়ে এক হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌ছিল—তাতে না ছিল কোন স্বার্থের গন্ধ, না ছিল কোন কামনা। কিন্তু এই অতি-স্বাভাবিক সম্বন্ধ মানুষের সমাজে টেঁকে না! মানুষ তাকে কোন পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ফেলে তার একটা ব্যবহারিক নাম দিতে চায়। কিন্তু সে কথা পরে।

দেবদাস বড় হ'ল—তালসোনাপুর গ্রাম আর তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না, তাকে পড়ার জন্যে কলকাতা যেতে হ'ল। এইবার বৃহৎ জগতের সঙ্গে মোকাবিলা। সে জগতে কত আকর্ষণ—পোষাক, পরিচ্ছদ, সিনেমা, বায়স্কোপ, থিয়েটার, ফুটবল ম্যাচ্, কলেজ, প্রফেসার ইত্যাদি। এ জগতের কিছুরই সঙ্গে পার্ব্বতীর পরিচয় নেই—সে তার ক্ষুদ্র তালসোনাপুর গ্রামে দেব-দা'র পাঠশালা পলায়ন, বাঁধের ধারে ছোটাছুটি, কি একটা কাজে গাফিলতি হওয়ায় দেব-দা'র হাতে কঠিন শাস্তি প্রভৃতি হাজার রকমের স্মৃতি আঁকৃড়ে প'ড়ে রইল।

ইতিমধ্যে পার্ব্বতীও বড় হয়েছে। তার বিয়ে দেওয়া দরকার। দু'টিকে ছোটবেলা থেকে একত্র দেখে দেখে জীবনেও তারা একত্র গ্রথিত হয় এ ইচ্ছা পার্ব্বতীর বুড়ো ঠাকুর-মায়ের মনে জেগেছিল এবং তিনি কথাটা দেবদাসের জননীর কাছে একবার তুলেও ছিলেন, কিন্তু সমাজের পাষাণ-প্রাচীরে সজোরে মাথা ঠুকে তাঁর এ ইচ্ছা চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেল—রইল শুধু অপমানের

জ্বালা। দেবদাসের জননী ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, বেচাকেনা-ঘরের মেয়ে তিনি নেবেন না। একটা অতি সহজ সরল সম্বন্ধ সমাজের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের বাষ্পে পুড়ে খাক্‌ হ'য়ে গেল।

পার্ব্বতী সুন্দরী ছিল—সুতরাং তার বিয়ের জন্যে তার বাপ ভাবিত হন নি। বরঞ্চ দেবদাসের বাড়ীতে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে তাঁর জিদ বেড়ে গেল এবং একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা ক'রে ফিরে এলেন। এইবার পার্ব্বতীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

স্ত্রীলোকের সাধারণত আঁকড়ে ধরবার প্রবৃত্তি। ছোটবেলা থেকেই পার্ব্বতীর চিত্তাকাশে এক দেবদাস ব্যতীত আর কেউ বিরাজ করে নি। সে একেবারে সমর্পিতপ্রাণা—সুতরাং অন্যকে ভজনা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। দেবদাসের উপযুক্ত সহচরী সে—ভয় ডর লজ্জা তার ধাতে ছিল না। সে রাত্রে গোপনে দেবদাসের সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লে, আমাকে পায়ে স্থান দাও।

পুরুষ নিজের মনের খবর নিজেই অনেক সময় রাখে না। দেবদাস শুনেছিল, পার্ব্বতীর সঙ্গে বিয়েতে তার বাপমায়ের আপত্তি। পার্ব্বতী যে এতটা দুঃসাহসের পরিচয় দেবে তার জন্যেও সে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং পরের দিন বাপের কাছে বিয়ের কথা তুলে বকুনি খেয়ে সে কল্‌কাতায় চ'লে গেল

এবং সেখান থেকে পার্ব্বতীকে লিখে দিলে যে সে তাকে কোনদিনও খুব ভালবাসত না।

ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে হাস্‌লেন। চিঠি ডাকে দেওয়ার পর থেকেই দেবদাসের মনে উল্টা স্রোত বইতে আরম্ভ হ'ল। সহসা তার নজরে পড়ল কল্‌কাতায় এসে সে যা পেয়েছে তার চেয়ে সে হারিয়েছে অনেক বেশী। কলকাতার পাওনার তুলনায় পার্ব্বতী যে অনেক বড়! ফলে সে আবার বাড়ী ফিরে গেল এবং চেষ্টা ক'রে পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা করলে। পুকুরের পাড়ে দু'জনের এই দেখা হওয়ার দৃশ্য শুনেচি চলচ্চিত্রের জগতে অতুলনীয় হ'য়ে আছে। পার্ব্বতী চিরকালই অভিমানিনী মেয়ে—স্বেচ্ছায় যে অর্ঘ্য সে দেবদাসের পায়ে নিবেদন করেছিল তাকে পদদলিত করায় সিংহিনীর রুদ্ধসম্মান আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিল। সে বল্লে, চলচ্চিত্ত তোমাকে বিশ্বাস নেই। এইবার ভুল এবং অভিমানের ভিতর দিয়ে জীবনের নাট্যলীলা জ'মে উঠল।

পার্ব্বতীর বিয়ে হ'য়ে গেল, দেবদাসও কল্‌কাতায় ফিরে এল। এখন তার জীবনের যেন আর কোন অবলম্বন রইল না। পার্ব্বতী গত এবং অনাগত জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করেছিল, তাকে হারানোর আলোয় সেটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সাম্‌নের বাকী জীবন মরুভূমির মত ধূ ধূ করচে—শুষ্ক, বিস্বাদ, রিক্ততার দৈন্যে অবসন্ন। জীবনে আর কিছু করণীয় নেই—করার শক্তিটুকুও যেন

পার্ব্বতী নিয়ে চ'লে গেছে। সুতরাং কোন আশা নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন উদ্যম নেই—আছে কেবল নিরাশার তপ্ত জ্বালা, যে নিতান্তই আপনার ছিল তাকে গ্রহণ না করার শাস্তিপূর্ণ আত্মগ্লানি। ভবিষ্যতে জীবন-মরুভূর মাঝখানে কোন ওয়েশিস্ই চোখে পড়ে না—কানে আসে দিগন্তপ্রসারী ক্লান্তিকর একটানা একটা সুর—পার্ব্বতী নেই, নেই, নেই! মনের যখন এই রকম আলুথালু নিরাবলম্ব অবস্থা তখন দেবদাসের বন্ধু জুটলো চুণিলাল।

দেবদাসের মনে শান্তি নেই, অথচ চুণিলাল দিব্য নিশ্চিন্ত। দেবদাস মনে করলে তবে হয় ত চুণিলালের সঙ্গে গেলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। পাপের প্রথম দর্শনে দেবদাসের ভদ্র মন সঙ্কুচিত হয়েছিল কিন্তু ক্রমশঃ তার পিচ্ছিল পথে অবতরণ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হ'ল না। এ কাহিনী আর বাড়িয়ে লাভ নাই—বাকিটা সকলেরই জানা।

যে বস্তুর অভাবে দেবদাস তর-তর ক'রে অধঃপথে নেমে গেল, সে বস্তু যে ইচ্ছাশক্তি এ কথা সম্ভবত বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের বাঙালীর মনে আর একটি এই ধরণের প্রেমের ইতিহাস প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে —সে হ'চ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ এবং শৈবলিনীর প্রেমকাহিনী। দেবদাসের সঙ্গে প্রতাপের প্রভেদ এই যে প্রতাপ রিপুজয় করেছিল—দেবদাস পারে নি। প্রতাপ শৈবলিনীকে কম ভালবাস্‌ত তা নয়,—শৈবলিনী বলেছিল, তুমি

থাকৃতে আমার সুখ নেই, তাই প্রতাপ যুদ্ধে প্রাণ দিলে। গঙ্গার গর্ভেও প্রতাপ অনেকবার ডুবে মরতে গেছে—শৈবলিনীই বরং পারে নি। প্রতাপের প্রেম মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত—শৈবলিনীকে পাওয়া অসম্ভব জেনে সে সংসারের মধ্যে বৃথা কোলাহলের সৃষ্টি করতে চায় নি, নিজেই আস্তে আস্তে স'রে গিয়েছিল। ' শৈবলিনীর পরম মঙ্গলই ছিল তার কাম্য—তার দেহ কোনদিন সে চায় নি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সগর্ব্বে বলেছেন যে প্রতাপের পুণ্যকাহিনী বর্ণনা ক'রে তাঁর লেখনী ধন্য হ'ল।

এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা ব'লে রাখি। আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর উপর অবিচার করেছেন। প্রতাপকে মনে মনে ভজনা করার জন্যে তিনি শৈবলিনীকে যে রকম প্রায়শ্চিত্তের তুফানে নাকানি-চুবুনি খাইয়েচেন অতটা কিন্তু না করলেও পারতেন। বাস্তবিকই বিবাহের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা যদি দুটি প্রাণকে একত্র করা হয়, তবে প্রতাপই ত শৈবলিনীর স্বামী—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যে লোকাচার তাকেও ত সে কোনদিন ক্ষুণ্ণ করে নি। সমাজের কাঠামোকে অবিচলিত রাখার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসে একটি চিরবিশ্বসিত shibbolethকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেচেন মাত্র। কিন্তু সে কথা যাক্।

ইচ্ছাশক্তির অভাবে মানুষ যে কি-রকম নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে তার আর একটি উদাহরণ আমরা পাই টুর্গেনিভের "রুডিন্"

নামক উপন্যাসে। এই রুডিনের চরিত্রে অনেকগুলি গুণের সমাবেশ হয়েছিল—সে বক্তৃতা ক'রে মানুষের মন হরণ করতে পারত, বুদ্ধি ছিল তার সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী, সব কথা চট্ ক'রে বুঝতে এবং বুঝিয়ে বল্‌তে তার দক্ষতা ছিল। মাথায়ও অনেক মতলব খেল্‌ত—কিন্তু বিধাতা পুরুষ তাকে মেরুদণ্ডহীন ক'রে গড়েছিলেন। যদি বক্তৃতা ক'রেই জীবনকে পুষ্পিত ক'রে তোল্‌বার উপায় থাকৃত তবে রুডিনের জীবন ব্যর্থ হ'ত না, কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিধাতা চান কাজ এবং কাজকে গ'ড়ে তোলবার অটুট্ ইচ্ছাশক্তি। তাই রুডিন জীবন-ভোর ভেসে ভেসেই বেড়াল—কোথাও স্থিতিলাভ করতে পারলে না। সংগ্রাম ক্ষেত্র হ'ল তার শেষ শয্যা—এ বিষয়েও প্রতাপের সঙ্গে রুডিনের মিল আছে।

দেবদাসও যে নিছক কামনার তাড়নায় দেহপণ্য-জীবিনীদের দ্বারস্থ হয়েছিল এ কথা বল্‌তে পারি নে। মনের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চুণিলাল তাকে যে পথের পথিক ক'রে দিয়েছিল সে নির্ব্বিচারে সেই পথ বেছে নিয়েছিল এবং তাকে কাটিয়ে ওঠ্‌বার শক্তি তার ছিল না। প্রবৃত্তির লাগাম চড়িয়ে জীবনকে পিশাচের লীলাভূমি কর্‌লে যে শান্তি পাওয়া যায় না, শান্তি যে সংরুদ্ধবীর্য্য নিবৃত্তিকামীদের করায়ত্ত, এ কথা কেউ কোনদিন দেবদাসকে বুঝিয়ে বলে নি। তাই সে হতভাগ্যের হিসাবের ভুল হ'য়েছিল।

কিন্তু সেই কারণে দেবদাসকে পেঁচি-মাতালের কোঠায় ফেল্‌লে তার উপরই অবিচার করা হবে। তার মধ্যে প্রেমের স্পর্শমণি ছিল—তা না হ'লে তাকে অবলম্বন ক'রে চন্দ্রমুখী সোনা হ'য়ে উঠ্‌তে পারত না। সে নিজে মন্দ হ'য়েও অন্যের ভালকে উদ্বোধিত ক'রে তুলেছিল। সে বিপথগামী কিন্তু দুরাচারী নয়—নিজের শরীরের উপরই সে অযথা অত্যাচার করেছিল কিন্তু মন ছিল তার নিষ্কলুষ। শেষ পর্য্যন্তও তার মনে নীচতা প্রকাশ পায় নি। 'নারান্‌' বলেন মানুষের মধ্যে একরকমের স্বভাব আছে যা ভালবাসা ব্যতীত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। * এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেবদাস যে সেই স্বভাবের মানুষ ছিল একথা বোধ হয় হলফ্‌ ক'রে বলা যায়। জীবনে সে অনেক শাস্তিই পেয়ে গেছে—মরণের পরে এ পারের দেনা এপারেই চুকিয়ে গিয়ে সে যেন নির্দেন অবস্থায় বিধাতার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে এই প্রার্থনাই আজ করি। যদি তাকে পুনর্জ্জন্ম দেন তবে যেন এই বহুসংস্কারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষে সে আর না জন্মায়।

* There are certain natures—and they are frequently the highest type of our kind—who cannot drown love by any means except love. With them, it is a homeopathic kind of treatment that is indicated—to cure like with like. Work, other interests, travel—nothing on God's earth will drive away the melancholy and fretting of the soul with such unhappy creatures. Nothing but love...'

—*Bree Narran.*

বিন্দুর ছেলে

শরৎচন্দ্রের গল্প বা উপন্যাস পড়া এক, তাদের সম্বন্ধে লেখা আর। তাঁর লেখা পড়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়েচে কিন্তু নিজে কেঁদেচি বলেই অপরকে কাঁদাতে পারব এমন কোন যুক্তি নেই। কেন না, একটা নির্ভর করে নিজের উপর, আর একটা নির্ভর করে নিজের শক্তির উপর। শরৎ বাবু সত্যিই বলেচেন যে, চোখ দুটো থাকলেই পড়া যায়, কিন্তু হাত দুটো থাকলেই ত লেখা যায় না।

'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' এবং 'পথ-নির্দ্দেশ, শরৎচন্দ্রের এই তিনটি গল্পকে **triplet** বলা যায়। তিনটিই ব্রহ্মদেশে লেখকের প্রবাসকালে লেখা হয়েছিল, প্রথমে 'রামের সুমতি', তার পর 'পথ-নির্দ্দেশ', আর তার পর 'বিন্দুর ছেলে'। সব গল্পই 'যমুনায়' ছাপা হয়। তখনো 'ভারতবর্ষ' জন্মগ্রহণ করে নি। যখন 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' বেরুচ্ছিল, তখন "ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' বেরুচ্ছিল। দু'জন শক্তিশালী লেখকের লেখার মধ্যে এইটুকু সংযোগ বর্ত্তমান আছে।

বিন্দুর ছেলে

শরৎবাবুর নিজের মত ও-তিনটি গল্পের মধ্যে 'পথনির্দ্দেশ' সব চেয়ে ভাল উত্‌রেচে, যদিচ সাধারণের রায় তা নয়। সাধারণে বলে 'বিন্দুর ছেলে' ও-তিনটি মণির মধ্যে কৌস্তভ এবং আমার মনে হয় তারা মিথ্যা বলে না। কোন একটি আদর্শের উপর লেখকের পক্ষপাত থাকা অসম্ভব নয়। আর 'পথ-নির্দ্দেশে'র আদর্শের উপর যে শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত আছে সেটা তাঁর অন্য লেখা থেকে ধরা পড়ে।

'বিন্দুর ছেলে' যখন প্রথম বেরুতে সুরু হয় তখন পাঠক-মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সকলেই বলেছিলেন, কথা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবার একজন প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েচে। শরৎ বাবুর পরবর্ত্তী কালের লেখা তাঁর সে গৌরব বাড়িয়েচে বই কমায় নি এবং তাঁর সে গৌরব আজও তেমনি অম্লান। এ কথাও বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যের দরবারে শরৎচন্দ্রের আসন চিরস্থায়ী হয়ে গেছে—কেননা শরৎচন্দ্র তাঁর যে অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন-রসের পাত্র পূর্ণ করেচেন তা' সত্যিই বিচিত্র এবং অভিনব। সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে মধু গল্পাকারে নিঃসৃত হয়েচে তার জুড়ি মেলাতে বাংলাদেশকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

*   *   *   *

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায় যারা

মনঃপ্রধান—মনের জোরেই তারা নড়ে-চড়ে বেড়ায়—শরীরটা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ গৌণ। বিন্দু এই শ্রেণীভুক্ত। সে বড়লোকের মেয়ে—ছেলে পুলে হয় নি—ফিটের ব্যামো ছিল। কোন কারণে মন খারাপ হলেই তার মূর্চ্ছা হত। তার বড় জা অন্নপূর্ণা একদিন এই ফিটের ব্যামোর এক আশ্চর্য্য দৈব ঔষধ আবিষ্কার করলেন। মূর্চ্ছা হবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিজের দেড় বছরের ছেলে অমূল্যকে বিন্দুর কোলে বসিয়ে দিলেন—ছেলে কাঁচা ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠ্‌ল—বিন্দু প্রাণপণ বলে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলে—সে দিন আর মূর্চ্ছা যাওয়া হ'ল না। এর পর থেকে অন্নপূর্ণা বিন্দুকে একেবারে ছেলে দিয়ে দিলেন।

বাড়ীতে আর ছেলে পুলে ছিল না। সুতরাং অমূল্যধন দুই মাকে আশ্রয় করে বড় হতে লাগ্‌ল। বিন্দু যখন ছেলে নিয়ে পড়ল তখন ঐ তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। বড় হয়ে তার ছেলে মানুষের মত মানুষ হবে, দশজনে প্রশংসা করে বল্‌বে ঐ অমূল্যর মা' এই ছিল তার আদর্শ। ঐ আদর্শে এতটুকু আঘাত লাগ্‌লেই বিন্দু ক্ষেপে উঠ্‌ত। শেষে হলও তাই। ঐ ছেলের বিষয় নিয়েই তাদের দুই জায়ের মনান্তর হয়ে গেল।

ছেলেকে মানুষ করবার সংকল্প মনে থাকৃলে তার বাপ মাকে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়েও সাবধান হতে হয়। নরেন বিন্দুদের বাড়ী আসা পর্য্যন্ত বিন্দু অমূল্যকে নিয়ে বিব্রত হয়ে

পড়েছিল। নরেন বয়াটে ছেলে—সে যাত্রাদলের গান গায়, অ্যাক্টো করে, আর পড়াশোনার নামে মা। নরেন আসার পর থেকে অমূল্যর দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটার সখ হ'ল, তার পকেটের মধ্যে পোড়া সিগারেটের অংশ পাওয়া গেল, অবশেষে সে বিন্দুকে না বলে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হেড্‌মাষ্টারের জরিমানার টাকা শোধ করলে।

বিন্দু অমূল্যর ধরণ দেখে ক্রমশঃই মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল, শেষের ঘটনায় সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠ্‌ল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল বেচারী অন্নপূর্ণার উপর। কেন না তিনি টাকা না দিলে ত অমূল্যর এত সাহস হ'ত না। রাগের মাথায় বলে ফেল্‌লে, 'কার পয়সা খরচ কর সেটা দেখ্‌তে পাও না? কার রোজগার খাচ্চ পর্‌চ, সেটা জান না?'

অন্নপূর্ণা নিঃস্ব ঘরের মেয়ে ছিলেন—তিনি এই শ্লেষবাক্য সহ্য করতে পারলেন না। বিশেষ করে তিনি অনুমান করে নিলেন যে, এই শ্লেষের মধ্যে ভাসুরের উপার্জ্জনহীনতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে। তাঁর স্বামীগর্ব্বে আঘাত লাগ্‌ল। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যি করে ফেল্‌লেন যে, বিন্দুদের দেওয়া ভাত আর খাবেন না—যদি খান ত যেন ছেলের মাথা খান। এই দিব্যি শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে দীর্ঘ বার বচ্ছর পরে বিন্দু ফের মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

বিন্দু অন্নপূর্ণাকে দেবীর মত ভক্তি করত—অন্নপূর্ণা বিন্দুকে সন্তানের চেয়েও ভালবাস্তেন। বিন্দু বল্‌ত যে অন্নপূর্ণাই আদর দিয়ে তার মাথা খেয়েচেন। সময়ে অসময়ে সে গল্প বলার জন্যে দিদির গলা জড়িয়ে আব্দার করত। বিন্দু যখন এই ঝগড়ার পর নতুন বাড়ীতে ছিল তখন তার মা তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথা তুল্‌লেন। বিন্দু রাজি হল না—বল্‌লে, 'না, মা, তা' হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ যেখানেই থাক, সেই সব।' এখানে অন্নপূর্ণা বিন্দুর কাছে তার মায়ের চেয়েও উঁচুতে স্থান পেয়েচেন।

বিন্দু যে শুধু অন্নপূর্ণার কাছেই আদর পেত তা নয়—ভাসুর যাদবেরও সে অশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। তিনি কোন দিন বিন্দুকে 'বৌমা' বলে ডাকেন নি, 'মা' বল্‌তেন। বিন্দুর কোন কথাই তাঁর কাছে কোন দিন উপেক্ষিত হয় নি। তারই কথামত তিনি পাঠশালা উঠিয়ে এনে বাড়ীতে বসিয়েছিলেন। যখন দুই জায়ে ঝগড়া হ'ল—পৃথগন্ন হলেন—তখন পর্য্যন্ত যাদব বিন্দুর একরত্তি দোষ দেন নি। বলেছিলেন, 'আগাগোড়াই কাজটা ভাল করনি, বড়বৌ। আমার মাকে তোমরা কেউ চিন্‌লে না। আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ, এই যদি না মাপ কর্‌তে পারবে তবে বড় হয়েছিলে কেন?' সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী এসে শুন্‌লেন বিন্দুর ভয়ানক অসুখ, বললেন, 'কত

সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আন্‌লুম বড়বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে ? আমি এখন যাব।' এর চেয়ে সহজ এবং সরলভাবে স্নেহের আন্তরিকতা প্রকাশ করার উদাহরণ আমার আর জানা নেই।

বিন্দুও এই ভাসুরকে দেবতার মত ভক্তি করত। বলেছিল, 'এমন দেবতার মত ভাসুর পেতে অনেক জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই।' তাই বাপের বাড়ী গিয়ে যখন সে মরণাপন্ন তখন বাপ মায়ের কথায় ঔষধ পথ্য খেলে না, স্বামীর কথায় কোন ফল হ'ল না, এমন কি অন্নপূর্ণার কথাও সে দিন কোন কাজে এল না। একমাত্র যাদবের কথাই সে দিন সে রেখেছিল। এইখানে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা একটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

যাদব বল্‌লেন, 'বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি।' 'আর একদিন যখন এতটুকুটি ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আবার আস্‌তে হবে ভাবি নি। তা মা শোনো, যখন এসেচি তখন হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় ও-মুখো আর হব না। জান ত মা, আমি মিথ্যে কথা বলি নে।' সত্যভাষণপুঞ্জিত আত্মবিশ্বাসের এর চেয়ে শক্তিময় প্রকাশ কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি না আমি জানি নে।

বিন্দুর আদর্শবাদের কথা আগেই বলেচি—তার মন ভাঙ্‌লে শরীর আর টেঁকে না। যে অমূল্য তাকে ছেড়ে একটা রাত ঘুমুতে পারত না, তাকে যখন সে এক মাসের উপর চোখে দেখ্‌তে পেলে না, যখন সে বুঝ্‌লে দিদি তাকে ত্যাগ করেচেন, বঠ্‌ঠাকুরকে সে অপমান করেচে, তখন জগতে বেঁচে থাকার সব অবলম্বনই যেন তার হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। বাপের বাড়ী এসে তার জ্বর হ'ল—দিনে দু'বার তিনবার মূর্চ্ছা হ'তে লাগ্‌ল—অবশেষে শেষ মূর্চ্ছা আর ভাঙ্‌তে চায় না। যদি বা কোন গতিকে ভাঙ্‌ল, নাড়ি তখন একেবারে বসে গেছে। তারপর যখন সে ফের অমূল্যকে দেখ্‌লে, দিদিকে দেখ্‌লে, ভাসুর ঠাকুরের কথা শুন্‌লে, তখন তার মন স্বপ্রতিষ্ঠ হ'ল, শরীরও সারল। অমূল্য, দিদি, ভাসুর ঠাকুরকে নিয়েই তার সংসার—মাধব যেন সেখানে গৌণ—বিন্দু-চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব।

মাধব যাদবের বৈমাত্রেয় ভাই কিন্তু দাদার উপর এই ছোট ভাইটির শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। লেখক সেটা অনেক কথার ভিতর দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচেন। মাধব বল্‌চেন, 'আর গোলমাল করো না, যাও। বোঠান যে রকম করে পা ফেলে বেড়াচ্চেন, দাদা এখনি উঠে পড়বেন।' 'পাগল তুমি! দাদা শুনেচেন, আর গোলমাল করো না!' বিন্দু যখন চুপ করে থাকার জন্যে অনুযোগ করেছিল তখন মাধব বল্‌লেন, 'ও-বিদ্যে আমার দাদার কাছে

শেখা। ঈশ্বর করুন, যেন অমনি চুপ করে থেকেই এক দিন যেতে পারি।

অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর কলহের কথা মাধব শুনেছিলেন। বিন্দু রাগের মাথায় যা বলেচে সেটা যে তার মনের কথা নয় তা মাধব বিলক্ষণ জান্‌তেন। কিন্তু তবু ভাই-এর অপমান তার মর্ম্মে গিয়ে বিঁধেছিল। বিন্দু যখন দুঃখে অনুশোচনায় কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল তখন তার কষ্ট মাধব বোঝেন নি তা নয়, তবু দাদাকে বিন্দুর হয়ে কিছু বল্‌তে রাজি হলেন না। বল্‌লেন, 'হাজার দিব্যি করলেও আমি দাদাকে বল্‌তে পার্‌ব না। তিনি নিজে জিজ্ঞাসা না কর্‌লে গিয়ে বলব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেল্‌লেও হবে না।'

কিন্তু এর চেয়েও মাধবের আরো বড় পরিচয় পরে আছে। বিন্দুকে বলেছিলেন, 'সংসারে যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ মা মরেচেন জানি নে; বড়-বৌঠানের মুখে শুনি আমরা বড় গরীব কিন্তু কোন দিন দুঃখ কষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপ্‌ধপে কাপড় জামা এসেচে তা আজও বল্‌তে পারি নে। তারপর উকীল হয়ে মন্দ টাকা পাইনে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে; এমন অট্টালিকাও তৈরি হ'ল—অথচ দাদাকে দেখ,

চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনেও তাঁর গায়ে কখন জামা দেখি নি—একবেলা এক মুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্যে—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়ার দরকারও দেখিনে—শুধু দিনকতক আরাম করছিলেন—তা ভগবান সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিচ্ছেন।' এই উক্তির মধ্যে যাদবের নিঃশব্দ আত্মদানের যে কাহিনী নিহিত আছে এবং মাধবের যে ঐকান্তিক ভ্রাতৃভক্তি এবং tenderness প্রকাশ পেয়েচে অন্য দেশের সাহিত্যে তার জুড়ি আছে কিনা সন্দেহ।

আমার মনে হয় misunderstanding সকল সংসারেই হয়, যেমন বিন্দুদের সংসারে হয়েছিল কিন্তু অমন অন্নপূর্ণা আমাদের সংসারে নেই বলে, আর যাদবের মত আমরা নিজেরা কেউ নই বলে আমাদের misunderstanding এর গ্রন্থি আর কিছুতেই খোলে না।

* * * *

বাংলা দেশের পারিবারিক জীবনের রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিনে আজ তাঁর উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে নমস্কার করি। তিনি আমাদের পরিশ্রম-খিন্ন অভাব-অনটন-পরিম্লান নীরস জীবনের দ্বারে মাধুর্য্যের যে আস্বাদ বয়ে নিয়ে এসেচেন তার জন্য তাঁকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের ভাই-বোনের সম্বন্ধকে মধুর

করেছেন, দেবর-বৌদিদির সম্বন্ধকে অকৃত্রিমতার গৌরবে পূত করেছেন। তাঁকে না পেলে আমাদের জীবন-পুস্তকের একটি অধ্যায়ই অনুন্মুক্ত থেকে যেত—জীবনকে গ্রহণ করবার একটী পরিপ্রেক্ষিতাই (perspective) আমাদের চোখে পড়্‌ত না। তাঁকে না পেলে আমরা রমেশকে পেতুম না—উপীনকে পেতুম না—মহিমকে পেতুম না। নারায়ণীকে পেতুম না—সাবিত্রীকে পেতুম না—রমাকে পেতুম না—

'তোমাকে ঘেরিয়া আজি নাচে মত্ত বিজয়িনী দল,
গ্রহে গ্রহে প্রণব-ওঙ্কার;
হে নারীত্রাণের মূসা, হে গঙ্গার নব-ভাগীরথ
সেবকের লহ নমস্কার।'

বিরাজ বৌ

শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত রচনা পাঠ করিয়া পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল 'বিরাজবৌ' তাহাদের অন্যতম নহে। অপরপক্ষে কাহারো কাহারো মুখে শুনিতে পাইয়াছি বইখানির একঘেয়েমী দোষ আছে। যাঁহারা এ মতের পোষকতা করেন তাঁহাদের নেহাত দোষ দেওয়া যায় না, কারণ বইখানি আগাগোড়া একটানা দুঃখের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী—ইহার মধ্যে সুখদুঃখের ওঠাপড়ার ইতিহাস নাই—আর কোন ঘটনাবৈচিত্র্যের সমাবেশ নাই—যাহা আছে তাহা ঐ দুঃখ-বৈচিত্র্যেরই এপিঠ ওপিঠ। সমস্ত বইখানির মধ্য দিয়া নীলাম্বর এবং বিরাজবৌ-এর অপরিসীম দুঃখের করুণ কাহিনী স্বচ্ছ বর্ত্তিকার মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই একটানা দুঃখের বেদন-ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মন হাঁপাইয়া ওঠে, কিন্তু সেজন্য গ্রন্থকারের কোন অপরাধ নাই। যদি অপরাধ কাহারও থাকে তবে সে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের ভাগ্য-বিধাতার যিনি এর ঘরে ঘরে এমন অকাতরে দুঃখের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন।

তাই আমার মনে হয় এই বইখানি একেবারে খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় (eastern)—ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শবাদের অথবা ঘটনা

বিন্যাসের কোনরূপ ছায়াপাত নাই। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমার কথা পরিস্ফুট হইবেঃ—'গাঁয়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে নীলাম্বরের যখন জ্বর হইল বিরাজবৌ সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠা কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল—পাঁচদিন পরে নীলাম্বরের জ্বর ছাড়িলে মা শীতলার পূজা পাঠাইয়া দিয়া তবে জলগ্রহণ করিল। মা শীতলার নিকট মানস করিয়াছিল, 'ভাল যদি কর মা তবেই আবার খাব দাব, না হলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবো।' মনে ভাবিয়াছিল, 'সিঁথের এ সিঁদুর তোল্‌বার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেল্‌বো।'

অবস্থাবৈগুণ্যে নীলাম্বরের যখন আর দিন চলাচলের উপায় রহিল না তখন সে কিছুদিনের জন্য বিরাজকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় যাইতে চাহিয়াছিল—বিরাজ ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখাইয়া প্রতিবাদ করিতে পারিল না কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া যাওয়ার বিরুদ্ধেও তাহার মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল—অবশেষে "অসুখ কচ্চে" "বড্ড অসুখ কচ্চে" বলিয়া দুয়ারের গাড়ী ফিরাইয়া দিল। তাহার মনের ভাব গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, 'ঘুম ভেঙে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না।'

উপরে যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম তাহা পাশ্চাত্য-দেশীয়দের চক্ষে হাস্যকর—তাহারা ইহার যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিবে না—ইহাকে নারীত্বের যুক্তিহীন লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়া এতদ্দেশীয় নারীজাতির প্রতি তাহারা কৃপাকটাক্ষ করিবে। বস্তুতঃ তাহাদেরও দোষ নাই। সতীত্বের এ আদর্শ ভারতবর্ষের জলহাওয়া ব্যতীত অন্যত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ভারতবর্ষের নিজস্ব—যুগযুগান্তের ঐতিহ্য এই আদর্শকে পরিপুষ্ট করিয়াছে—তবে নারী স্বামীত্বের আইডিয়ার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে।

আরও একটি কারণে এই বইখানিকে আমি খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় বলিতে চাই—ইহার আখ্যানবস্তুর ভিতর দিয়া ভারতবর্ষীয় ভাগ্যবাদ (**Fatalism**) স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজ স্বামীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি? নীলাম্বর উত্তর দিয়াছিল, 'যিনি ভাব্‌বার তিনি ভাব্‌বেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।' থামিয়া বলিয়াছিল, 'তা ছাড়া ভাব্‌তে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে?' কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিয়া-ছিল, চেয়ে দেখ্‌ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজাকে মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে—আমি ত অতি তুচ্ছ।'

ইহাই ভারতবাসীর চরম ভাগ্যবাদীত্ব—তাহার সকল দুঃখের মূল, তাহার সকল দুঃখের কারণ। বুদ্ধিবৃত্তির দোহাই দিয়া মানুষ

বিরাজ বৌ

আবহমান কাল সুখদুঃখের কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—কত দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে, কত বিচার করিয়াছে—কত বিশ্লেষণ করিয়াছে কিন্তু সেই উত্তমং রহস্যং সেদিনও যেমন সুদূরে ছিল, আজও তেমনি সুদূরে আছে।

মাত্র তিন চারিটি চরিত্র এই আখ্যায়িকার সম্পদ—কিন্তু ইহারাই তাহাদের জীবনের ধারা দিয়া বইখানিকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নীলাম্বর আর বিরাজবৌ-এর চরিত্রের চারিপাশে ঘটনাপরম্পরা পাক খাইয়া ফিরিয়াছে—এই দুইটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্য বুঝিতে পারিলে বাকি অংশটা স্বচ্ছ হইয়া যায়।

নীলাম্বর মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে পারিত। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। সে যেমন গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনি অখ্যাতিও লাভ করিয়াছিল। ইহা বোধ হয় অতিরিক্ত শক্তিরই অপরাধ—শক্তির আতিশয্যকে সকলে সহ্য করিতে পারে না, গোঁয়ার্তুমির নাম দিয়া নিজেদের অক্ষমতাটুকু ঢাকিয়া লয়। এই বিংশ শতাব্দীতে নীলাম্বরের মত লোক আর জন্মগ্রহণ করিতেছে না—এ যুগে সকলেই কাজের লোক—নীলাম্বরের মত do-nothingsদের এ যুগে স্থান নাই। গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'নীলাম্বরের মা সাত বৎসর পূর্ব্বে তিন বৎসরের শিশুকে বউ ব্যাটার হস্তে সমর্পণ করিয়া

স্বর্গারোহণ করেন। 'সেই দিন হইতে নীলাম্বর সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন করিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবহেলা করে নাই। নীলাম্বর যদি বিংশ শতাব্দীর আদর্শ কাজের লোক হইত তবে ঠিক ইহার উল্টাটাই করিত অর্থাৎ রোগীর সেবা করিত না, মড়া পোড়াইত না, কীর্ত্তন গাহিত না, গাঁজা খাইত না কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু অবহেলা করিত।

এই নীলাম্বর অতিরিক্ত সোজা ধরণের লোক ছিল। নিজের স্বভাবসিদ্ধ সরল বুদ্ধি দিয়াই জগৎটাকে বুঝিতে চাহিত। মা ছোট বোনটীর ভার তাহার মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন—নগদ যাহা কিছু ছিল, বিরাজের গায়ের অলঙ্কার, তুইখানি বাগান বিক্রয় করিয়া এবং যদু মোড়লের দরুণ ডাঙ্গা বাঁধা দিয়া, এক কথায় অবস্থার অতিরিক্ত করিয়া ভাল ঘরে বোনটির বিবাহ দিল। নিজের কি করিয়া চলিবে এ কথাও যেমন একবার ভাবিল না, হরিমতি পীতাম্বরেরও বোন, তাহারও এ বিবাহে অর্থসাহায্য করা উচিত, একথাও তেমনি একবার মনে পড়িল না। অধিকন্তু জামাইএর মাসে মাসে পড়ার খরচ জোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিল। তাহার পর উপর্য্যুপরি তুই বৎসর অজন্মা হইল—ভদ্রাসন বাঁধা পড়িল—হালের গরু মরিল—পুকুর শুকাইয়া রৌদ্রে ফাটিতে লাগিল, তথাপি নীলাম্বর ধার করিয়া যতীনের পড়ার খরচ

জোগাইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, 'পুঁটির শ্বশুর বড়লোক, সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে আমরা পড়াব কেন? যা' হয়েছে তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পারবে না।' নীলাম্বর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেছি যে। তার কি হবে? একথারও উত্তর বুদ্ধিজীবিনী বিরাজ দিয়াছিল, 'শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন তিনি আমার কষ্ট বুঝ্‌বেন, কিন্তু অদৃষ্টবাদী সত্যনিষ্ঠ নীলাম্বরের তাহা কোন কাজেই লাগিল না। সে নিজেকে ধ্বংস করিয়াই শপথের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ হতভাগ্য নীলাম্বর জড়াইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িল। অদৃষ্টের লেখায় তাহার অসীম বিশ্বাস ছিল—তাই মনে মনে কাহাকেও দোষ দিল না—কাহারও নিন্দা করিল না। সে লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজকর্ম্ম জানিত না—জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিল না। এই বুদ্ধিভ্রংশের অবস্থায় সে নেশার ঝোঁকে এক মারাত্মক ভুল করিয়া বসিল।

মা বাঁচিয়া থাকিতে একদিন তিনি শপথ দিয়াছিলেন বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। মাত্র একদিন এই শপথ সে ভুলিয়াছিল—অম্‌নি কোথা হইতে কি হইয়া গেল! তিনদিন

এক গঙ্গাযাত্রীর নাড়ি ধরিয়া সে ত্রিবেণীতে বসিয়াছিল—বিরাজ তখন ঘরে একাকী জ্বরে ভুগিতেছে—তবুও নীলাম্বর নিরুপায়ের অনুরোধ এড়াইয়া চলিয়া আসিতে পারে নাই। কিন্তু এই তিন দিন অবিরত গাঁজা খাওয়ার ফলে সে আর প্রকৃতিস্থ ছিল না। বাড়ী ফিরিয়া অন্ধকার রাত্রে স্ত্রীকে ঘরে না পাইয়া বহুদিন-বিস্মৃত এক সন্দেহ অকস্মাৎ তাহার বুকের ভিতর মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। বিরাজও চিরকাল অতিরিক্ত অভিমানিনী—সে তাহার অনুপস্থিতির কোন সদুত্তর দিতে চাহিল না। নীলাম্বর ডিবা ছুঁড়িয়া মারিল—দেখিতে দেখিতে রক্তে মুখ ভাসিয়া গেল। বিরাজের আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল। এই আঘাত last straw on the camel's back হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "এই এক বছর যাই যাই করছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি নি। চেয়ে দেখ দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখ্‌তে পাইনে, এক পা চল্‌তে পারিনে—আমি যেতুম না; কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নীচে মরবার লোভ আমার সব চেয়ে বড় লোভ, সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়্‌তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম।" ইহা অপেক্ষা আর কোন করুণকাহিনীর করুণতর বর্ণনা পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না।

বিরাজ ত চলিয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নিরক্ষর মূর্খ গোঁয়ার নীলাম্বর তাহা লইয়া হৈ চৈ বাধাইয়া কুরুক্ষেত্র করিল না। ইহার জন্য বিরাজকে মনে মনে এক বিন্দু দোষ দিল না। অত্যন্ত ব্যথার সহিত অন্তর্য্যামী ঠাকুরের পায়ে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, 'সে যখন এতটুকু অপরাধ করে নি, তখন তার সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না।' যখন জানিতে পারিল বিরাজ মরে নাই, কুলত্যাগ করিয়াছে, তখনো তাহাকে অপরাধী করিতে পারিল না। মনে মনে এই কথাই বলিতে লাগিল, সে যাহা করিয়াছে ক্রোধের বশে জ্ঞান হারাইয়াই করিয়াছে। 'দেহে তখন তার প্রাণ ছিল না, ভাল করে জ্ঞান বুদ্ধি হবার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়ে দিয়েছিল।' আর তাহার উপর আমি যে অত্যাচার, যে অপমান করিয়াছিলাম তাহা সহ্য করিতে বোধ হয় স্বয়ং নারায়ণও পারিতেন না—সে ত মানুষ। ইহাই আকাঙ্ক্ষাহীন ক্ষমার অপ্রমেয় মহিমা, ইহাই গভীরতম প্রেমের অনির্ব্বচনীয় হীরক-দ্যুতি। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশীয়েরা ইহাকে হয়ত নিস্পৌরুষ আখ্যায় অভিহিত করিবেন।

তাই তারকেশ্বরের পথে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত পরপারের যাত্রী মুমূর্ষু বিরাজের ভঙ্গুর দেহখানি যখন দৃষ্টিগোচর হইল তখন নীলাম্বর একবার দ্বিধা করিল না, ইতস্ততঃ করিল না, 'স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র

শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাসার দিকে চলিয়া গেল।' মনে মনে এই কামনাই করিতে করিতে গেল যে, নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম—ভগবান করুন যেন পরজন্মেও তাকে পাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে। নীলাম্বর এই রকম করিয়া বুঝিয়া ঠকিয়াছিল কিনা একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ যে মনে মনে তাহাকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত, এ কথা নিঃসন্দেহ। তাই দাসী সুন্দরী পর্য্যন্ত তাহার নামে অপবাদের ইঙ্গিতটুকু সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ভালবাসার লোককে বলিয়া বসিল, 'বরং তোমার মুখই মলে পুড়বে না, আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেছ।' ঐ নীলাম্বরের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের তেজ বিদ্যমান ছিল, তাই সুন্দরী বলিয়াছিল, 'বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না, যেন আগুন জ্বলচে।' শিল্পীর কথার এক একটী আঁচড়ে নীলাম্বরের চরিত্র যেন পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় দল খুলিয়া খুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর বিরাজবৌ। কীর্ত্তন গানে একটা পদ শুনিয়াছিলাম, 'প্রতি অঙ্গ মোর কানুক্ষুধাতুর'—বিরাজের স্বামীপ্রেম ঐ ধরণের। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিরাজ বৌ

বিরাজের প্রেমের সব চেয়ে বড় কথা, 'তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি ?'

এই বিরাজের সতীত্বের বড় অহঙ্কার ছিল। একদিন লীলাচ্ছলে বলিয়াছিল, 'অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখ্‌তে সাধ হয় তারা কি রকম।' আরও বলিয়াছিল যে সতীত্বে সাবিত্রীই হউন বা আর যেই হউন, কাহারও চেয়ে সে এক তিল কম নয়। বিধাতা তাহার এ দর্প সহ্য করেন নাই। তাই তাহাকে অসতীর কলঙ্ককালিমায় লাঞ্ছিত হইতে হইল। কিন্তু এত বড় দর্পিত সতীকেও কি কারণে বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে পা বাড়াইতে হইল তাহা বুঝিতে হইলে বিরাজের সেই সময়কার মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক।

তিন দিন জ্বরভোগের পর বিরাজ তখন ক্ষুধায় আকুল। জন-প্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে জ্বরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্পা স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া রাখিয়া নীলাম্বর পরোপকারে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ঘরে আসিয়া অভুক্ত থাকিবে স্মরণ করিয়া বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁড়ালের বাড়ী চাল ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে সদ্যগৃহপ্রত্যাগত গঞ্জিকা-রক্তচক্ষু স্বামী অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। তর্ক বিতর্কের ফলে স্বামী তাহাকে মারিয়া বসিলেন—তখন তাহার জ্বর বিকারে দাঁড়াইয়াছে। সেই

বিকারের ঝোঁকে কেবল মনে হইতে লাগিল, স্বামী বলিয়াছেন—তাহার.হাতের ছোঁয়া জল খাইবেন না। এই চিন্তার পাশাপাশি কে তাহার ছোঁয়া জল খাইলে ধন্য হইয়া যাইবে তাহার কথাও মনে পড়িল। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। তাহার পরের সমস্ত ঘটনা ছায়াচিত্রের মত তাহার Subconscious mindএর সাম্‌নে অভিনীত হইয়া গেল—তাহাতে সে যেন কোন Party নয়। যে মুহূর্ত্তে এই বিকারের ঝোঁক কাটিল সেই মুহূর্ত্তেই অতল জলে ঝাঁপ দিল। কোথায় ঝাঁপ দিতেছি, এখানে কত জল, মরিব কি বাঁচিব এ চিন্তা একবারও মনের মধ্যে উদয় হইল না।

এই বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী ছিল, কিন্তু তবু সে তাহার রূপকে কোনদিন বড় করিয়া দেখে নাই। বলিয়াছিল, "রূপ রূপ, রূপ। শুনে শুনে আমার কান ভোঁতা হয়ে গেল। * * এইটেই কি আমার সব চেয়ে বড় বস্তু?" রূপটাই যে বিরাজের বড় বস্তু নয় গ্রন্থকার তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

তাহার পর ছোট বৌ এর কথা। এমন একটি মধুর চরিত্র কদাচিৎ চোখে পড়ে। একদিনের যে মার বিরাজ সহ্য করিতে পারিল না সেই মার প্রত্যহ তাহার ভাগ্যে জুটিত। কোনদিন তজ্জন্য সে তাহার স্বামীকে দোষ দেয় নাই। বরঞ্চ যেদিন বিরাজ এই মারের কথা জানিতে পারিয়াছিল সেদিন পাছে সে কোনরূপ শাপসম্পাত করে এই ভয়ে স্বামীর হইয়া সে ক্ষমা চাহিতে

আসিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন তিনিই মাপ করবেন।'

এই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজা বিরাজকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত। গ্রন্থকার একটী একটি লাইনে তাহার চরিত্রের চাবি উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন, 'চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে। ছোট বৌ এর স্বভাবে বিনয় বস্তুটি আশ্চর্য্য রকমের পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বিরাজের সঙ্গে সে নিজেকে কোন দিন তুলনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। বলিয়াছিল, 'কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কই নি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই।' কিন্তু প্রত্যেকটী বিপদের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে এবং সে তাহার যথাসাধ্য করিয়াছে—ফল হয়ত সব ক্ষেত্রে হয় নাই। কিন্তু এই যে কোমল প্রকৃতির মাটীর মানুষ, কর্ত্তব্যক্ষেত্রে এও ইস্পাতের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজকে একদিন কথা দিয়াছিল, দুই ভাইয়ে মিল করিয়া দিবে। বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া যেই শুনিল, দিদি নাই অমনি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। ভাসুরের ভার সে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিল। পীতাম্বর কহিয়াছিল, 'দাদার সঙ্গে কথা কও শুন্‌লে লোকে নিন্দে করবে যে।' উত্তরে স্বল্পভাষিণী বলিয়াছিল, 'লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি।

এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি লোকের নিন্দা আমি মাথায় পেতে নেব।'

বিরাজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল অচলা—এই বিশ্বাস তাহার নারায়ণ। ইহারই জোরে বিরাজ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ ধাঁধাঁর জড়িমা ছিল না। তাই যখন সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইল ছোট বৌ যাইতে চাহিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারবো না, বাবা। * * * স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরার বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হতে পারে না। সতী লক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বেন —যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাক্‌ব—আমাকে কোথাও যেতে বল্‌বেন না, বাবা।' এইখানে ছোট বৌ ভালবাসায় নীলাম্বরকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

আজকাল আমরা সকল সৃষ্টির মধ্যেই moral খুঁজিয়া বেড়াই। শরৎচন্দ্রের অবদান এদিক দিয়াও সামান্য নহে। মাতৃপিতৃহীনা ছোট বোন পুঁটির উপর নীলাম্বরের যে স্নেহ বর্ষার অফুরন্ত ধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়াছে, নিঃসন্তান বিরাজবৌ নিজের বুকের সমস্ত মাতৃস্নেহ দিয়া যেরূপ সন্তর্পণে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, এই সমস্ত উপাখ্যান যদি আমাদের দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত পারিবারিক জীবনকে মধুর করিয়া তুলিতে না পারে তবে যে আর কিসে

পারিবে তাহা আমার জানা নাই। পরিশেষে ছোট ভাই পীতাম্বর যখন সর্পদষ্ট হইয়া নীলাম্বরের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "আমার কোন ঔষধপত্র চাই না, দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচ্‌তেও চাইনে," সেইদিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল। এই ভ্রাতৃস্নেহ-পূত অশ্রু যদি আমাদেরও চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরাইতে সমর্থ না হয় তবে আর কিসে পারিবে?

শরৎচন্দ্রের গল্প বা উপন্যাস যে সকলকে মুগ্ধ করে না তাহার কারণ আমার মনে হয় এই যে তাঁহার লেখার আবেদন পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তির (intellect) কাছে নয়, তাহার রসবোধের কাছে। যাঁহারা অতিমাত্রায় intellectual, তাঁহাদের খোরাক হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে শরৎ-সাহিত্যে মিলে না, কিন্তু যাঁহারা জীবনে দুঃখের এবং নিরাশার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া সোনা হইয়াছেন তাঁহারা এই সাহিত্যে এমন এক রসস্রোতের সন্ধান পাইবেন যাহা সত্য সত্যই অভিনব এবং অমূল্য।

শরৎচন্দ্রের ভাষার এবং ভাবের সংযম অসামান্য একথা সকলেই জানেন। এখানে তাঁহার একটা লাইন উদ্ধৃত করিতেছি:—'সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো এক মুহূর্ত্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোট বৌ তেমনি করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল।' সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই অভিব্যক্তি,

এতটুকু আতিশয্য ইহাতে নাই। এই সংযম বা সংহৃত শক্তি ব্যতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অসম্ভব। ইহাকেই ম্যাথু আর্নল্ড austerity বলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রকে যদি কেহ দুষ্কৃতি-প্রচারক বলিয়া মনে করেন তবে তিনি ভুল করিবেন। অপর পক্ষে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র খুব বড় taskmaster. বিরাজ বৌ-এর ঐ পদস্খলনের জন্য তিনি তাহাকে বড় কম সাজা দেন নাই। তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল—সুন্দর মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া যদি বা নীলাম্বরের সাক্ষাৎ মিলিল ত সে কেবল তাহার পায়ের তলায় মরিবার জন্যই—তখন আর বড় বাকি নাই। এই রকম করিয়া হতভাগীর এ জন্মের সব সাধ ফুরাইল—দাবী রহিল কেবল জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবার। এই বিষয়ে শরৎচন্দ্র Victor Hugoর সহিত তুলনীয়। তিনিও Jean Valjeanএর এক টুক্‌রা রুটি-চুরি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—Esmeralda-র মায়ের পতিত জীবন ক্ষমা করিতে পারেন নাই, যদিও সে বেচারী দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর অনুতাপ করিয়া কাটাইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজবৌ’ গল্পোপন্যাস পাঠ করিবার পর এবং আমার এত কথা বলিবার পরও যদি কাহারো মনে সন্দেহ বিদ্যমান থাকে যে বিরাজবৌ সতী কিনা, তবে তাঁহাকে একটা

কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। হিন্দুর বিবাহ এক জন্মের নহে—তাহা যুগ-যুগান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের। বিরাজ বৌএর বিচার দুটো দিনের ব্যবহারের উপর করা চলে না। তাহার বিচার কল্পান্তের কালমেখলার তরফ হইতে, ভগবানের বুকের নিকষমণির তরফ হইতে।

চরিত্রহীন

'লে মিজারাব্‌ল' ইংরাজিতে তর্জ্জমা করলে যেমন হয় 'The Miserables' অর্থাৎ কিনা 'হতভাগ্যেরা', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' মানেও তেমনি 'চরিত্রহীনেরা'। বিড়ম্বিত এই দুই দলের ভাগ্যের মধ্যে যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে বলে মনে হয়।

শরৎবাবুর উপন্যাসখানির নাম যদিচ চরিত্রহীন, কিন্তু তাদের আসলে কেউ চরিত্রহীন নয়, বইখানির এইটুকুই হচ্চে মজা। সতীশ আর সাবিত্রী, দিবাকর আর কিরণময়ী, কেউই চরিত্রহীন নয়। সতীশ সাবিত্রীকে নষ্ট করতে পারে নি, দিবাকরও কিরণময়ীকে নষ্ট করতে পারে নি। অথচ সমাজের বিচারে তারা ত চরিত্রহীন বটেই, হয়ত আরো কিছু বেশী। কেননা সতীশ লুকিয়ে মদ খেত, আর বাসার একটা ঝিকে ভালবেসেছিল। কিরণময়ী তার পাতান দেওরকে ভুলিয়ে নিয়ে আরাকানে পালিয়েছিল। সমাজ এইটুকু শুনেই কানে আঙ্গুল দেবেন কিন্তু যাঁরা উপন্যাসখানি শেষ পর্য্যন্ত পড়েচেন তাঁরা জানেন যে প্রকৃত অপরাধ বল্‌তে যা বোঝায় তা' এঁদের কেউই করেন নি।

উপন্যাসখানিতে দুটি ভালবাসার প্রসঙ্গ দেখান হয়েচে আমাদের

সামাজিক বুদ্ধিতে যা' নিন্দনীয়—এক সতীশের সাবিত্রীকে ভালবাসা, আর কিরণময়ীর উপেন্দ্রকে ভালবাসা। (অথচ সকলের উপরের কথা হচ্চে এই যে কোন ভালবাসাই গর্হিত নয়, যেহেতু ভালবাসা একটা কাজ নয়; ও হচ্চে মনের একটা বিশেষ শক্তি। কোন্ ক্ষেত্রে কাকে অবলম্বন ক'রে এই শক্তি বিকাশ লাভ করবে তা' বল্‌বার যো নেই।) কোন ভালবাসাই যে কারুর সমর্থনের অপেক্ষায় বসে থাকে না একথাও সহজে বোধগম্য। ও পাওনা কখন যে সুরু হয় যে পায় সেও জান্‌তে পারে না। তারপর যখন একদিন জান্‌তে পারে তখন তার হৃদয়ের দুকূল বয়ে প্লাবন সুরু হয়, আর সমস্ত জীবন ভরে তারই সুখ এবং দুঃখের লীলা চলে। সুরবালা একদিন বিয়ে সম্বন্ধে উপেন্দ্রকে একটা কথা বলেছিল—বলেছিল, আমি যে-ঘরেই জন্মাই না কেন আমাকে নিতে তোমাকে আস্‌তেই হ'ত অর্থাৎ যে যার পত্নী হবে, সে আগে থাকৃতেই ঠিক হয়ে আছে। সামাজিকের কানে এর চেয়ে শ্রুতিমধুর কথা বোধ হয় আর কিছু নেই। কিন্তু ভালবাসা সম্বন্ধেও কি একথা সত্য নয়? সতীশ যে সাবিত্রীকে ভালবাস্‌বে, এও আগে থাকৃতে ঠিক হয়ে আছে—কেউ কি ইচ্ছা করলেই কাউকে ভালবাস্‌তে পারে? বিয়ে আর ভালবাসা এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ ত কেবল সামাজিক স্বীকৃতির (Sanction-এর)—নয়ত দুই-এর মধ্যে বস্তু একেবারেই এক।

এই দুই ভালবাসার পাশাপাশি আমাদের সমাজে স্বীকৃত এক ভালবাসার চরম রূপ দেখান হয়েচে—সে হচ্চে উপেন্দ্র আর সুরবালার ভালবাসা। এ ভালবাসার মোহনরূপ অস্বীকার করবার যো নেই কিন্তু এই সম্পর্কে সমাজকে আরো একটা কথা মনে রাখ্‌তে অনুরোধ করি। মানুষ যে স্ত্রী পুরুষ অভেদে অবস্থার দাস একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। ভাগ্যিস্ উপেন্দ্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে হয়েছিল তাই তাদের প্রেম এমন মাধুর্য্যে মণ্ডিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। উপেন্দ্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে না হয়ে যদি কিরণময়ীর বিয়ে হত তা'হলেও যে সে-প্রেম এই রকম সার্থক হয়ে উঠ্‌ত, একথা হলফ্ করে বলা যায়। অপর পক্ষে সুরবালার সঙ্গে যদি হারাণের পরিণয় ঘট্‌ত, তবে তাদের সে-সম্বন্ধ যে গুরুশিষ্যার সম্বন্ধকে অতিক্রম করে যেতে পারত একথা জোর করে বলা শক্ত। কেননা সব প্রেমেরই সার্থকতা পরস্পরের understanding এর উপর নির্ভর করে—কোন পক্ষে থেকে তার অভাব হলেই আর পূর্ণ পরিণতি ঘটে না। এই কারণেই এ-বস্তু এত দুর্লভ—আর এই কারণেই এর অমর্য্যাদা করতে নেই। উপীন-সুরবালার প্রেমকে আদৌ ছোট করে দেখ্‌চি নে—কেবলমাত্র এই কথা বল্‌তে চাইচি, যে এ একটি বিশেষ ঘটনার সমাবেশের ফল অর্থাৎ এই প্রেম নিয়ে যেমন উল্লাসে লম্ফ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, কিরণময়ী-উপীনের প্রেম নিয়ে তেমনি বিষাদে আত্মহত্যা করবারও আবশ্যকতা নেই।

চরিত্রহীন

উপীন আর সতীশের চরিত্র একটু অলোচনা করে দেখা যাক্। উপীনের ছিল বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, আর অকলঙ্ক চরিত্র। বিশ্ববিস্থালয়ের সবগুলি পরীক্ষা তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিলেন। আর চরিত্রে তাঁর কেউ কোন দিন নিন্দার বাষ্পটুকুও আরোপ করতে পারে নি। ইনি হচ্চেন আমাদের সামাজিক আদর্শের চূড়ান্ত—যদিচ এখন আবার বিশ্ববিস্থালয়ের উপাধির উপর সুধীজন বিরূপ হয়েচেন। এই উপীনের চারিত্রিক শুভ্রতা এত সযত্নে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হত যে কালিমার ঘেঁসটুকুও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রমাণ যেদিন তিনি সস্ত্রীক সতীশের বাসার দরজায় এসে দাঁড়ালেন, পলকমাত্র সাবিত্রীকে দেখেই তিনি ফিরে চল্লেন—এ কে, কেন এখানে এসেচে, এখানেই থাকে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন একবারও সতীশকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অথচ সতীশকে তিনি হাতে গড়ে মানুষ করেচেন, তাকে তিনি ভাল করেই চেনেন বলে তাঁর গর্ব্বের অন্ত ছিল না। এ ভুলের জন্য তিনি পরে সতীশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, সাবিত্রীকে নিজের বোন বলে প্রচার করে ক্ষতিপূরণও করেছিলেন কিন্তু সেদিন তাঁর অত্যুচ্চ চরিত্র-গৌরব বাধাস্বরূপই হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ, দিবাকর কলেজ খোলা সত্ত্বেও কলেজে ভর্ত্তি হয় নি, কিরণময়ীও তাকে সজাগ করে দেয় নি, শ্বাশুড়ী অঘোরময়ী উভয়ের সম্বন্ধকে ভাল চোখে দেখেন না, এই সব থেকে তিনি ধরে নিলেন যে কিরণময়ী-দিবাকরের সম্বন্ধটা অত্যন্ত মন্দ

দাঁড়িয়েচে। কিরণময়ীর দেওয়া খাবার খেলেন না, সে যখন পা জড়িয়ে ধরলে তখন গালিগালাজ করে তাকে পা দিয়ে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না—এ সব কি ঐ অভ্রভেদী চরিত্রগৌরবেরই দম্ভ নয়? এত অসহিষ্ণুতা কেন? অথচ আমাদের সমাজের যত যশঃ সবই এই উপীনের প্রাপ্য। কিন্তু আমার মনে হয় উপীনের এত ভালত্ব নিয়ে সংসার চলে না। তাই যখন সুরবালা চলে গেল, দিবাকর-কিরণময়ী কঠিন আঘাত করে অজ্ঞাতবাস করলে, এক কুৎসিৎ সন্দেহের ফলে সতীশকে ত্যাগ করতে হ'ল, তখনই আমরা প্রকৃত বড় উপীনকে পেলুম। এ আর সে দাম্ভিক অসহিষ্ণু উপীন নয়—এ উপীন হচ্চে ক্ষমাশীল করুণাদ্রব-হৃদয়। উপীনের অতি-ভালত্বের সঙ্গে সংসার খানিকটা খাদ মিশিয়ে তাকে ব্যবহারিক জগতের উপযোগী করে নিলে।

সতীশ অনেক কষ্টেও একটা পাশ করতে পারেনি—ডাক্তারী পরীক্ষাটাও শেষ করতে পারলে না। লুকিয়ে মদও খেয়েচে, গানের আসরও তাদের অস্থানে হয়েচে। কিন্তু এর গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ, গান গাইতে, বাঁশী বাজাতে এর জুড়ি ছিল না, যাত্রার ষ্টেজ বাঁধ্‌তে, মড়া পোড়াতে সে ছিল অগ্রণী। পরের দুঃখে তার হৃদয় যে কত কাঁদ্‌ত তার আর লেখাজোখা ছিল না—বেহারীর কথায় তার বহু প্রমাণ আছে। টাকাকে টাকা বলে কোন দিন সে গ্রাহ্য করে নি—অমন উদার ভাবে ব্যয় করতে ক'টা লোককে দেখা

যায়? সাবিত্রীকে সে ভালবেসেছিল কিন্তু:কোন দিন কোন ছলে, কোন সুবিধার পরিবর্ত্তেই তাকে অস্বীকার করে নি—এমন কি সরোজিনী-জ্যোতিষের সাম্‌নে কৈফিয়ৎ দেবার দিনও নয়। তার মনের কথা আর মুখের কথা কোন দিন আলাদা হয় নি। উপীন যে কালিমার ছোঁয়াচটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারেন নি, সতীশ তারই মধ্যে ডুবে রত্ন আহরণ করেছিল। সাবিত্রী যে গৃহস্থের কূলবধূ নয়, সে যে সামান্য দাসী মাত্র, একথা সতীশ বুঝ্‌ত না তা নয়, কিন্তু তার প্রেমে সে তাকে মহীয়সী করে দেখেছিল। তাই সরোজিনীকে লাভ করার বদলেও সে সাবিত্রীকে ত্যাগ করতে চায় নি। আরাকানে যেদিন সে মূর্চ্ছিতা কিরণময়ীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল, সে দিন সে ঘরের কুশ্রীতা, অন্ত্যজ বাড়ীউলী, চারিদিকের বিভীষিকাময় দারিদ্র্য—কিছুই তার মনের প্রসন্নতাকে খর্ব্ব করতে পারে নি, চিরদিনের মত সহজ কণ্ঠে 'বৌঠান' বলে ডেকে দাঁড়িয়েছিল। দিবাকরকে তিরস্কার করার কথাও তার মনে হয় নি, বরং দিবাকর ফিরে আস্‌তে চায় না শুনে নিজে তার চেয়েও বেশী অত্যাচার করেচে, এই কথা বলে দিবাকরের অপরাধকে তুচ্ছ করে দিয়েছিল। মনের এই আশ্চর্য্য উদারতা, এই পরম পবিত্র প্রসন্নতা কম শক্তির পরিচায়ক নয়! এত শক্তি ছিল বলেই সে কুলভ্রষ্টা সাবিত্রীকে ভালবাস্‌তে পেরেছিল—কম শক্তিমান হলে পারত না। কিরণময়ীর দেওয়া উদাহরণ এইখানে মনে পড়ে। কৃষ্ণকান্তের

উইলের প্রসঙ্গে কিরণময়ী বলেছিল যে, গোবিন্দলাল মানুষ হিসাবে হরলালের চেয়ে কোন অংশেই ছোট ছিল না কিন্তু সাংসারিক ভাল মন্দ, নিন্দা প্রশংসার কথা খতিয়ে হরলাল রোহিণীকে নিতে চায় নি, গোবিন্দলাল তাকে মাথায় করে নিয়েছিল। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে অপাত্রে ভালবাসা ন্যস্ত হয়েচে শুন্‌লেই আমাদের সামাজিকেরা যেমন চম্‌কে উঠেন, বাস্তবিকই ব্যাপারটা তত সোজা নয়। বহুদর্শিতার ফলে দেখা গেছে যে এ সব বিষয়ে অনেক কথা ভেবে দেখ্‌বার আছে। প্রশ্ন উঠ্‌বে, :যে প্রত্যেকে এ বিষয়ে মত চালাতে গেলে সমাজ টেঁকে না। এর উত্তরে কিরণময়ী বলেছিল, এ-রকম প্রত্যেক বিষয়ে সমাজ যদি তার মত চালাতে চায় তা'হলেও মানুষ টেঁকে না। কথাটা খুব সত্যি। বুঝি আমাদের সমাজ ভেঙ্গে গেল, এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদা আড়ষ্ট হয়ে আছি। মানুষ টেঁকে কি না, এ-কথাটা কোন দিনও ভেবে দেখ্‌লুম না। কিন্তু আজ সে কথা ভেবে দেখ্‌বার দিন এসেছে। আজ মানব-মনের সাম্‌নে এই প্রশ্ন জেগেচে যে সতীশ বড় কি উপীন বড়, ভালবাস্‌তে পারার ক্ষমতা বড়, কি ভালবাসার উপর পদাঘাত করার ক্ষমতা বড় ?

কিরণময়ীর চরিত্র এক পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি—এরকম স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ না পেলে, কিম্বা নিজের মধ্যে কিরণময়ীত্বের অনুভূতি না জাগ্‌লে ও-চরিত্র বোঝাই যায় না, বিচার করা ত দূরের কথা।

খুব ঝোঁকের ওপর কাজ করা যে তার অভ্যাস ছিল এটা বোঝা শক্ত নয়। প্রথম রাত্রে বাড়ী-ঘর-দোর উপীন সব লিখে নেবেন কল্পনা করে সে কি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, শিষ্টাচার না মেনে কি রকম কলহে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সকলেরই মনে পড়বে। রূপ এবং বুদ্ধি বিধাতা তাকে পুরোপুরিই দিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন অদম্য জিগীষা। পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ অবস্থার দাস। এ হেন রূপগুণসম্পন্না নারীর বিয়ে হ'ল যাঁর সঙ্গে তিনি ভালবাসার কোন ধার ধারতেন না। তিনি নিজে ছিলেন নাস্তিক, স্ত্রীকেও নিরীশ্বরবাদিনী করে তুল্লেন। কিরণময়ী মামার বাড়ীতে মানুষ, সেখানে স্নেহের মুখ দেখেনি। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামী পড়িয়ে খুসী হতেন, শাশুড়ী নির্য্যাতন করে খুসী হতেন। ফলে তার প্রকৃতিতে নারীর কোমল বৃত্তিগুলি কোন দিনই বিকশিত হয়ে ওঠ্‌বার অবকাশ পেলে না, অপর পক্ষে বুদ্ধির প্রাখর্য্য বেড়ে উঠ্‌ল। সুরবালার এবং উপীনের দাম্পত্য-প্রেমের কাহিনী শুনে সে স্বামীকে ভালবাস্‌তে চেয়েছিল কিন্তু তখন too late তার স্বামী-সেবাও ছলনা নয়, আবার উপীনকে ভালবাসাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত দর্পিতা রমণী—উপেন্দ্রের নিষ্ঠুর অপমান, নিঃসঙ্কোচ পদাঘাত তাকে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল। সেই তীব্র অপমানে যে প্রতিহিংসাবৃত্তি জেগে উঠেছিল তার প্রভাবে নিজের কোন দুর্গতিই তখন আর তার অকরণীয় ছিল না। উপেন্দ্রের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে রাহুগ্রস্ত করাই তখন ছিল

তার লক্ষ্য। উপেন্দ্র বলেছিলেন, ভালবাস্‌লে কি কেউ এতটুকু ব্যথা দিতে পারে? সে হাত্‌ড়েই বেড়িয়েছে, কোন দিনই কিছু পায় নি। এ-ও সত্য। এইখানেই কিরণময়ীর চরিত্রের ট্রাজিডি। সে বারে বারে পথভ্রান্ত হয়েচে। কিন্তু ভালবাসার শক্তি তার কোন রমণীর চেয়েই কম ছিল না।

জ্বলন্ত বিশ্বাসের একটি চিত্র সুরবালা। তার বিশ্বাস এবং সরলতা তাকে অজেয় করেছিল। প্রখরবুদ্ধিশালিনী কিরণময়ীও একদিন সেই বিশ্বাসের পায়ে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছিল। কেননা বিশ্বাসের এমন একটি স্তর আছে যেখানে সে সমস্ত বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়। সুরবালা কোমলতারও প্রতিমূর্ত্তি।

সাবিত্রীর নাম তার পক্ষে অত্যুক্তি নয়। ভালবাস্‌লে যে কি রকম অত্যাশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ করা যায় সাবিত্রীই তার প্রমাণ। সতীশের পরম হিতই সে চিরদিন আকাঙ্খা করেচে—সতীশকে রক্ষা করার জন্যে, তার ঘৃণা, উপেক্ষা লাভ করার জন্যে সে মিথ্যানিন্দা, অপযশ বরণ করে নিয়েছিল কিন্তু তবু সফল হয় নি। সতীশের স্নেহের আগুনে সব পুড়ে গিয়েছিল। এই রকমই হয়। তাই এদের প্রেমের কাহিনী মনকে এত স্নিগ্ধ করে। সাবিত্রীর ত্যাগ এবং ধৈর্য্য অতি বড় শিক্ষিতাভিমানী রমণীকেও লজ্জা দিয়েচে। সুতরাং তার প্রেমকে আর ছোট করে দেখ্‌বার উপায় নেই। উপেন্দ্র তাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—তিনি আর তাঁর বোন সাবিত্রী

কোন দিন জগতে ছোট কাজ করেন নি—সে একেবারেই অতিরঞ্জন নয়।

'আমার মনে হয় শরৎবাবুর চরিত্রহীন বোঝ্‌বার মত মনের অবস্থা এখনো আমাদের অনেকেরই হয় নি। সর্ব্ববিধ সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করতে না পারলে এ উপন্যাসের রসোপলব্ধি হয় না।' শরৎবাবু বলেচেন যে, মানুষের ত্রুটি, বিচ্যুতিই তার একমাত্র নয়—তার মানবতা এ সকলের চেয়ে বড়। তিনি আরো বলেচেন যে কোন স্ত্রীলোককেই তিনি অসতী বলে মনে করতে পারেন না—তারা যেন একটা মুখোস পরে আছে মাত্র—ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্ত্তে এই মুখোস খুলে ফেল্‌তে পারে। এই সব কথাগুলি মাঝে মাঝে অনেক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হয় দেখ্‌তে পাই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের উপর এদের কোন effect নেই তার প্রমাণ পেয়েচি। এর কারণ theoretically ভাল লাগা এক, আর এই sentimentকে উপাদান করে জীবন গঠিত করে তোলা আর। তাই অতি সহজে এ সব কথাগুলি মুখস্থ হলেও ধাতস্থ হয় না। এখনো আমাদের সমাজে কেবলমাত্র বিবাহেরই ধ্বজা সু-উচ্চে উচ্ছ্রিত—বিবাহের পবিত্রতার সংস্কার আমাদের মনকে আঁকড়ে বসে আছে। প্রতি বিবাহেই প্রেমের আদান-প্রদান হয় এটা মেনে নেওয়া হচ্চে। অপর পক্ষে বিবাহের দ্বারা সুপবিত্র নয়, এমন সব ভালবাসাই দণ্ডনীয়—এটাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েচে। কিন্তু

খুজে দেখ্‌তে গেলে হয়ত শতকরা নিরনব্বইটি ক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, বিবাহিত জীবনে মমতাকে ভালবাসা বলে ভুল করা হচ্চে। এই সব ছোট এবং বড় সংস্কার মন থেকে অন্তর্হিত না হলে 'চরিত্রহীনে'র বিঁচার সম্ভব নয়। সাবিত্রী সতীশের মত ভালবাসা এতকাল আমাদের সমাজে ঘটে থাকৃলেও তাই নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়নি—কেননা এমন অপাংক্তেয় বস্তু যে উপন্যাসের উপকরণ যোগাতে পারে, একথা কারুর মনে হয় নি। আর তার একমাত্র কারণ, (শরৎবাবুর কথায়) ভালবাসার নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যিকার অধিকার সেই রকম দু'চারজন হতভাগ্যেরই জন্মায়, দুঃখের কারবারে যাদের ভরাডুবি হয়ে গেছে।

মনুষ্যত্ব যাচাই

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব বিচার করবার একটা সনাতন মাপকাঠি চলে আস্‌চে। এই মাপকাঠি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কি কি গুণ থাক্‌লে তাকে ভাল ছেলে বলা যায়, আর কি কি দোষ থাক্‌লে তাকে মন্দ মানুষ বলা যায়, সে সব আমাদের কণ্ঠস্থ। যেমন, ভাল ছেলে যে হবে সে বরাবর পাশ করে ক্লাশে উঠ্‌বে, ক্লাশে কারোর সঙ্গে খুনসুড়ি করবে না, কোন কারণেই অতিরিক্ত হাস্‌বে না, অতিরিক্ত কাঁদবে না, বাড়ীতে ভাই বোনের সঙ্গে মারামারি করবে না, থাওয়া-দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের জন্য বিন্দুমাত্র আব্‌দার করবে না, মোট কথা সে সকল রকমে সুবোধ আর সুশীল হবে। এই সুবোধ আর সুশীল ছেলে স্কুল ছেড়ে যখন কলেজে ঢুক্‌বে তখন প্রতিদিন তার নিয়মিত স্থানটিতে শিষ্ট হয়ে সে বসে থাক্‌বে, প্রফেসার অনর্গল যা' বলে যাবেন অবিচলিত চিত্তে সে তার নোট নেবে, পরীক্ষার শেষে ভাল ফল দেখিয়ে নিজের এবং বাপ মায়ের (যদি তাঁরা বেঁচে থাকেন) মুখ উজ্জ্বল করবে। এইবার বিয়ের বাজারে তার দর geometrical progressionএ হু হু করে বেড়ে যাবে। অনেক দর-কসাকসির পর যে মেয়েটির পাণি সে পীড়ন করবে সে মেয়েটী

জান্‌বে যে সেই বিবাহই হচ্চে তার জীবনের চরম সৌভাগ্য কিন্তু ভাল ছেলেটি এই বিবাহকে চির আচরিত একটি প্রথামাত্র বলেই গণ্য করবে। তার পর সে চাকরির উমেদার হয়ে ঘুরে বেড়াবে—জুট্‌তে দেরি হলেই তার ঝাল পড়বে স্ত্রীর অলক্ষণত্বের উপর। চাকরি পেলে অতি নিশ্চিন্ত ভাবে সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে, তাস-পাশার আসর সে বাদ দেবে না, আপিসে সাহেব তার উপর অত্যন্ত খুসী থাক্‌বেন—সমাজ বল্‌বে, হাঁ, এই ত মনুষ্যত্বের আদর্শ। আর সেও কেতাব থেকে বাঁধা বুলি আউড়ে morality, শিষ্টাচার, ভব্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে থাক্‌বে—মোট কথা তার জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে কোন দিক থেকেই কারোর মনে আর সন্দেহ থাকবে না।

এইবার মন্দ ছেলের বরাতটা দেখা যাক্‌। সে কোন বার পাশ করে ক্লাশে উঠ্‌বে, কোন বার ফেল্‌ কর্‌বে। টিফিনের সময় সুধীর হয়ে বসে থাকার সুনাম কেউ তাকে দেবে না। মত না নিয়ে বাগান থেকে কাঁচা আম সংগ্রহ করার অবিবেচনা তার দ্বারা ঘট্‌বে। বাড়ীতে ভাই-বোনকে ভালও সে বাস্‌বে, আবার মারধোর করার নালিশও তার নামে শুন্‌তে পাওয়া যাবে। স্কুলের ছেলেদের কেউ হবে তার বন্ধু, কেউ বা স্যাঙাত, আবার কেউ বা পরোক্ষে তার অজস্র নিন্দে করবে। পণ্ডিত মশাই বল্‌বেন, আমি জানি ওটার কিছু হবে না। একবারে না পারলেও দু' তিন বারে

পাশ করে কলেজের মুখ হয় ত সে দেখ্‌বে। কিন্তু সেখানেও সে সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে না। প্রফেসারের অন্যায় তিরস্কারের হয় ত সে একদিন প্রতিবাদ করবে। ফুটবল ম্যাচের গ্রাউণ্ডে তার গতি হবে অব্যাহত। থিয়েটার-সিনেমা দেখার কৌতূহল সে দমন করতে পারবে না। দেশ যখন একটা বৃহৎ ভাবাবেগে স্পন্দিত তখন সেই স্পন্দন হয় ত তার প্রাণে ঘা দেবে—হয় ত সে পড়াশোনা, ভবিষ্যতের আশাভরসা সব ছেড়ে দিয়ে একদিন সেই ভাবস্রোতে ভেসে যাবে—আবার কিছুকাল পরে হয় ত একদিন উজান বয়ে ফিরেও আসবে। তার আশা আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দেওয়ার বুদ্ধিকে লোকে সুবুদ্ধি বল্‌বে না। কলেজের পরীক্ষা পাশ করা হয় ত তার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে না—বাপমায়ের মুখও উজ্জ্বল হবে না—আর ঘটক-মহলে তার নাম ঘন ঘন ধ্বনিত হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলকে চকিত করে তুল্‌বে না। পিতার প্রশ্নের উত্তরে হয় ত সে বলে বস্‌বে অমুককে ছাড়া আমি বিয়ে করবো না। তার এই নির্ল্লজ্জতায় লোকে ছি ছি করবে। তার পর একদিন চাকরির চেষ্টায় সে বেরুবে—চাকুরি মিল্‌লেও তাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। সাহেব যে কাজে তার উপর খুসী থাকতে পারেন সেই কাজটাই হয় ত তার চোখে পড়বে না। সাহেবের উৎকট অভিমানকে সে হয় ত আমলই দেবে না এবং একদিন শ্বেতাঙ্গের আভিজাত্যটুকু ভুলে যাওয়ার ত্রুটিই হয় ত তার

দ্বারা ঘট্‌বে। ফলে তার চাকরি যাবে—আর এই চাকরি না রাখ্‌তে পারার অপরাধ সমাজ চাপাবে তার নির্ব্বোধত্বের উপর, আর তাকে সৃষ্টিছাড়া বলে উল্লেখ করবে। এই সৃষ্টিছাড়া লোকটি হয় ত অপরিসীম দুঃখে এমন কাজও করবে যাকে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না এবং তার পর একদিন তার সমস্ত দুষ্কৃতির হিসাব বুঝিয়ে দিতে এমন এক জায়গায় যাবে যেখানে প্রশংসার গৌরবে তার মুখ উজ্জ্বল হল কি নিন্দার কালিমায় তার মুখ মসীলিপ্ত হয়ে গেল তার কোন ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না।

কিন্তু এই মন্দ ছেলেটির বিধাতা তাঁর খাতা খুলে দেখ্‌তে পাবেন সেখানে এমন সব কাজের উল্লেখ আছে যা' ঐ ভাল ছেলেটিরই করবার কথা। একদিন চাকরির উমেদার অবস্থায় নিজের শেষ সম্বল চার আনা পয়সা সে একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে খাইয়ে দিয়েছিল। বন্যায় যখন দেশ ভেসে গিয়েছিল তখন সে পরীক্ষার পড়া না পড়ে রিলিফের কাজে দিনের পর দিন কাটিয়ে এসেচে। কল্‌কাতায় যখন সে মেসে তখন পাশের ঘরে এক ভদ্রলোকের মসুরিকা হয়েছিল—সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছিল, সে-ই কেবল পারে নি। তারপর অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে সে একা রাতের পর রাত জেগে তাঁকে নিরাময় করে তুলেছিল।

উপরের ঐ দুটি চিত্র থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে মানুষ মানুষের সম্বন্ধে কত কম জানে কিন্তু তবুও তার অপরকে বিচার

করবার ভার নিতে এক মুহূর্ত্তও দেরি লাগে না। অমুক ভাল কি মন্দ, অমুককে বর্জ্জন করাই বিধি কি তার সঙ্গ করাই যুক্তি—এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমাদের আদৌ ভাব্‌তে হয় না—উত্তর সব আগে থাকৃতেই ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রকৃত মাপকাঠিটা যে কি তাই আজো ঠিক হ'ল না। এতদিন আমরা যাকে মাপকাঠি বলে পূজা করে এসেচি সেটা হচ্ছে routineএর পূজা। যে যত এই routine ঘেঁসে চল্‌তে পারবে সে তত ভাল ছেলে। কিন্তু মাপকাঠিটা হবে routine কি life তাই আজকের দিনে বিচার্য্য।

শরৎচন্দ্র তাঁর মুন্সীগঞ্জের অভিভাষণে এই কথাটা তুলেছিলেন। স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে।" আজকের দিনে আমাদের কথাটাও তাই—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব রুটিনত্বের চেয়ে বড়—রুটিন মেনে চল্‌লে সংসারে সুখ এবং সুবিধা অশেষ কিন্তু যে বিশেষ করে প্রাণবান তার পক্ষে এ মেনে চলা সম্ভব হয় না। তাই তার সঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতির, নিয়মকানুনের,

আচারব্যবহারের বিরোধ ঘটে। Compromise করা তার স্বভাব নয় বলে সে তা' করে উঠ্‌তে পারে না—ফলে বিরোধ বেড়ে চলে এবং সমাজ তাকে বর্জ্জন করারই বিধি দেয়। কেন না সমাজ সাধারণ লোকের ব্যবস্থাই দিতে পারে, অ-সাধারণের জন্য কোন ব্যবস্থাই তার পুঁথিপত্রে লেখা নেই।

ভগবানের সৃষ্ট এই বিশ্বসংসার অতি বিচিত্র-রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, সুষমায় পরিপূর্ণ, উন্মদ, হিল্লোলিত। সুখ এবং দুঃখ, করুণা এবং অপ্রেম, ঔদার্য্য এবং কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাবরাশি এখানে সহস্র ধারায় সহস্র মুখে লীলায়িত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে—এই বিচিত্রতার মাঝখানে সকলের ডাক পড়ে না—কিন্তু যার পড়ে সে যে কিছুতেই ভাল ছেলে হয়ে সংসারের বাঁধা পথ দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চলে যেতে পারে না এ কথা হলফ করে বলা যায়। বাঁধা পথ থেকে বিচ্যুতির জন্যে সমাজ তাকে যে লজ্জা দেয় তা' হয় ত অপরিসীম কিন্তু তবু মন থেকে এ কথা কিছুতেই তাড়াতে পারা যায় না যে যিনি সব জানেন, সব দেখেন, তাঁর কষ্টিপাথরে এর মনুষ্যত্ব যাচাই করে তিনি যে দাম দিয়েচেন সমাজের দেওয়া দামের সঙ্গে তা' কোনমতেই মেলে না।

চলতি পথে

সেদিন ট্রেণে কল্‌কাতা থেকে দিল্লী আস্‌ছিলুম। তুফান মেল দূর যাত্রীর ভিড়ে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। ট্রেণ ছাড়ার সামান্য একটু আগে একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে আমাদের কামরায় ঢুকলেন। গাড়ীর লোক ত একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লো। কোনগতিকে তাদের থামিয়ে তিনি একটু খানি দাঁড়াবার স্থান করে নিলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

লোকটির বেশভূষার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। পরণে সাদা পায়জামা, গায়ে কালো রঙের কোট, মাথায় কালো রঙের টুপি। বড় বড় ছুটি চোখ, তাতে তার চেয়েও বড় বড় ছুটি চশমা, মাথায় বড় বড় চুল। চেহারায় বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।

গাড়ী খানিকক্ষণ চলার পর তিনি ইংরাজিতে বল্লেন, দেখুন, রেলওয়ে কোম্পানী যে আমাদের কাছ থেকে ভাড়া নেয়, তার বদলে তারা আমাদিগকে accomodation দিতে বাধ্য—এ দয়া নয়, এ ব্যবসার নিয়ম। হই না কেন আমরা থার্ড ক্লাসের যাত্রী, কিন্তু আমরা বস্‌বার জায়গাটুকু পাওয়ার অধিকারী। জায়গা দিতে

না পারলে টিকিট issue না করা উচিত। আমি পরের Stoppageএ গার্ডকে এ বিষয় জানাবো।

কথা বলার সুর এবং sentiment আমার কাছে নতুন লাগ্‌ল। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে সত্যিই ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ রকম নিজেদের অধিকার যাচাই করে দেখি নে।

ট্রেণ যখন চল্‌ছিল তখন অনেক সহযাত্রী উৎসাহ ভরে গার্ড সাহেবের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। ট্রেণ যখন থাম্‌ল তখন দেখলুম আমি ছাড়া আর বড় কেউ অবশিষ্ট নেই। 'যদি কোন গোলমাল হয়, আমি কেন ওর মধ্যে জড়াতে যাই' এই মনোভাব।

গার্ড সাহেবকে ব্যাপার জানালে তিনি আদৌ বিচলিত হলেন না। এ ত কিছু নতুন নয়, কারুর অজ্ঞাতও নয়। রেল কোম্পানী এই করে বহুকাল থার্ড ক্লাস যাত্রীদের দেহের উপর বাণিজ্য চালাচ্ছে। গার্ড সাহেব ত সেই কোম্পানীরই আজ্ঞাবহ। অবশেষে নাছোড়বান্দা লোকটিকে তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করবার সৎপরামর্শ দিয়ে সরে পড়লেন।

ষ্টেশন মাষ্টারও কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না, সুব্যবস্থাও করতে পার্‌লেন না। লোকটি তখন বল্লেন, আমার ভাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হোক্, আমি কল্‌কাতায় ফিরে যাব।

ষ্টেশন মাষ্টার বোধহয় জীবনে এমন লোকের পাল্লায় পড়েন

নি। তিনি বিড় বিড় করে বকৃতে বকৃতে পালিয়ে রেহাই পেলেন।

আমরা নিজেদের বিবরে ফিরে এলুম। লোকটি জিজ্ঞাসা কল্লেন, কেন ওরা আমাদের নালিশে কর্ণপাত করে না জানেন ?

আমি চুপ করে থেকে তাঁকেই কথা বল্‌বার অবকাশ দিলুম। তিনি বল্লেন, ওরা জানে আমরা নেটিভ, আমাদের নালিশের কোন জোর নেই। আমরা ত কিছু করতে পারব না। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ব্যাপার আলাদা হ'ত। আমি সে সব দেশ বেড়িয়ে এসেছি। তারা যাত্রীদের নালিশ এ রকম অগ্রাহ্য করে না—অগ্রাহ্য করবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয় না।

চিরকাল এই রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, সত্যিই ত। পয়সাও দেব, অথচ সেই পয়সায় পুষ্ট যে সব রেলের কর্ম্মচারী তারা আমাদের ন্যায্য নালিশটা কান পেতে শুন্‌বে না, এ কি বিড়ম্বনা !

ক্রমে এই লোকটির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'ল—দীর্ঘ পথে ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে এমন কোন আহার্য্য দ্রব্যই তাঁর সঙ্গে ছিল না। আমাদের এক বন্ধু ঐ ট্রেণে গয়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলেন, তিনি রাত এগারোটায় পৌছবেন, পূর্ব্বাহ্নে খবরও দেওয়া ছিল। সুতরাং তিনি তাঁর খাবার সানন্দে সকলের সঙ্গে ভাগ

করে খেলেন। জলযোগের পর বিড়ি ধরিয়ে আবার আমাদের আলোচনা জমে উঠ্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, আচ্ছা, আপনারা কি চান? কি আপনাদের লক্ষ্য?

'আমরা দু'বেলা পেটপুরে খেতে চাই এবং খাওয়াতে চাই। আমরা চাই না যে একজন বিনা পরিশ্রমে টাকার গাদার উপর শুয়ে থাকবে এবং আর একজন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তার পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট হয় এমন উপার্জ্জন করতে পারবে না। We don't want to exploit others, we don't want to be exploited.'

'আপনারা কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে এ মতবাদ প্রচার করেন না কেন?'

'কতবার চেষ্টা করেছি—কেউ আমাদের কথা কানে তুল্‌তে চায় না। সকলেই স্বরাজ পাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখ্‌ছে—অথচ দেশের লোকগুলো যে ক্ষুধার জ্বালায় গলায় দড়ি দিচ্ছে সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। স্বরাজ দাবী করার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে পারে এমন কণ্ঠ যে বুঁজে এল।'

'আমাদের দেশের লিডারেরা ত এ বিষয় কোন উচ্চবাচ্য করেন না, এর মানে কি? তাঁরা কি ইচ্ছা করেই এ সমস্যা এড়িয়ে চলেন?'

হঠাৎ তাঁর বড় বড় চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। একটু উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন, 'আমাদের দেশের লিডারদের উপর আপনার খুব faith আছে বুঝি ? আমার কিন্তু নেই। আমাদের দেশের লিডারেরা কেমন জানেন ? যেন hothouse plant—রঙ্গমঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ঘড়ি ধরে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—বক্তৃতার পরই তাঁরা মোটরে উঠে চলে যান। সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁদের কোনই যোগ নেই। হাঁ, লিডার বলি লেনিনকে—তাঁর জীবনী পড়্‌বেন। চিরটা কাল কুলির সঙ্গে কুলিগিরি পর্য্যন্ত করে গেলেন—বেশী বক্তৃতা দেওয়ার অবসর হয় নি। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ লিডারেরা ত নিজেরাই exploiters ; যাঁদের বিষয় সম্পত্তি আছে, তাঁরা tenant দের exploit কচ্ছেন, যাঁদের কলকারখানা আছে, তাঁরা labourerদের exploit কচ্ছেন। এঁরা যখন আবার মধ্যস্থ হয়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট মেটাতে যান তখন আমার যা' হাসি পায়—এই যেমন সে দিন গোলমুড়ী ধর্ম্মঘটে হয়েছিল।'

তিনি চুপ করলেন—আমিও কয়েক ঘণ্টার মত চুপ করলুম। তাঁর চিন্তাধারার যে big dose তিনি inject করেছিলেন তা' হজম করতে আমার সময় লাগ্‌ল।

পরদিন নতুন ঊষার সূর্য্যের পানে তাকিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি বিশ্বাস করেন একদিন আপনাদের উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হবে? পৃথিবীর সব মানুষ আর্থিক সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হবে, private property বলে কিছু থাকবে না, সকলেই দারিদ্র্যের কবল এড়িয়ে আনন্দে কালযাপন করবে?'

তিনি বল্লেন, "বিশ্বাস করি বৈ কি—তাই ত এই ideal নিয়ে জীবনপাত করে খাটচি। জানি সেদিন খুব নিকটে নয়—কিন্তু একদিন যে সেদিন আসবেই, ঐ পথেই যে মানুষের মুক্তি হবে, এ কথা নিঃসংশয়ে নিঃশ্বাস করি বলেই জীবনে ধন, জন, পুত্র, পরিবার প্রতিষ্ঠা, সম্মান কিছুই চাই নি।"

আমি নবোদিত সূর্য্যকে যুক্তকরে প্রণাম করলুম।

মানুষের অধিকার

সম্প্রতি এখানে একটি ঘটনা ঘটেচে। বাংলাদেশ থেকে এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যাঁর বাড়ীতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন তাঁর যজমান। কিন্তু ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত গুরুর সম্মান তিনি রাখেন নি। বাড়ীর কোণে একখানি পৃথক ঘরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দেখা শোনা পরিচর্য্যা করার ভার দেওয়া হয়েছিল একটা ঠিকা চাকরের উপর। তবু ভাল বল্‌তে হয় ঐ চাকরটাকে, সে রোগী ফেলে পালায় নি। কিন্তু সে বেচারী নিরক্ষর—কি-ই বা জানে! রোগী বলেছিল তেল মাখিয়ে দাও—হয়ত জ্বালার নিবৃত্তি হবে—সে তাই দিয়েছে। ফলে জ্বালার চোটে তিনি হাত পায়ের চাম্‌ড়া উপড়ে ফেলেছিলেন—মৃতদেহের সে কি করুণ বীভৎস দৃশ্য! এই রকম করে বিদেশে একটি জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েচে।

সন্ধ্যাবেলা এই ঘটনার উল্লেখ করে বন্ধু মহলে গল্প করছিলুম —উদ্দেশ্য ছিল সকলের কাছ থেকে একটু 'আহা', 'উহু' শোনা। কিন্তু দেখে আশ্চর্য্য হলুম বন্ধুরা এ বিষয়ে কেউ কানই দিলেন না—যেন এ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা—এতে যেন কিছুই ভাব্‌বার

নেই—যেন ঐ ভদ্রলোকের এই রকম করে মরাই উচিত ছিল। বেশ বোঝা গেল আমাদের হৃদয়হীনতা কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে!

আমার স্থির বিশ্বাস মানুষ কতকগুলি অধিকার নিয়ে জন্মায়। ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, শীতে গাত্রাবাসের মত রোগে ঔষধ এবং পথ্যও তার জন্মার্জ্জিত অধিকার। এই দাবী মেটায় সমাজ —অর্থাৎ সমাজের লোকেরা। তাই ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সামাজিক ধর্ম্ম বলে গণ্য হয়েচে। আমাদের পোড়া দেশে অবিশ্যি সবই উল্টো। এখানে ক্ষুধায়ও আহার মেলে না, শীতেরও উপযুক্ত পরিচ্ছদ মেলে না। পেটের জ্বালায় অনেক যুবক আত্মহত্যা করচেন এ সংবাদ খবরের কাগজে পড়চি। পড়ে একটু হা হুতাশ করা ছাড়া আর কেউ কিছু করেচেন বলে শুনি নি। যদি ঐ হতভাগ্য আত্মঘাতী যুবকবৃন্দ পুনরায় এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন, তবে আর একবারও যে তাঁদের আত্মহত্যা করতে হবে না তাই বা কে বল্লে? এই ক্রমাগত আত্মহননের পুঞ্জীভূত লজ্জা এবং নিষ্পৌরুষ একদিন হয়ত জাতির অসাড়তা ভাঙ্গাবে—কিন্তু সে কবে?

কিন্তু আমি শুধু এই কথাটাই ভাবি যে ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য দানের শক্তির অভাবের মত পীড়িতকে শুশ্রূষা করবার শক্তিও যদি আজ লোপ পেয়ে থাকে, তবে আমাদের এই জাতিকে

বাঁচাবে কে?:জাতি অমনি মুখের লম্বা চৌড়া কথায় বড় হয় না,বেঁচে থাকে না—তাকে প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে মানবত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। রাষ্ট্রে, বাণিজ্যে আমরা পরাজিত লাঞ্ছিত, কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের গৌরব করবার আছে—সে ধর্ম্মে। তারই আনুষঙ্গিক হৃদয় যদি আজ শুকিয়ে গিয়ে থাকে, যদি দুঃখ দেখ্‌লেই সমবেদনায় বুক উদ্বেলিত হয়ে না উঠে, যদি তখন ফিরে তাকাই, হিসাব করি, আগু পিছু করি, তবে মিথ্যাই আমরা বৈদেশিক রাজশক্তিকে দোষ দিই। হৃদয় প্রস্রবণের মূল বৈদেশিক রাজশক্তির হাতে ধরা নেই, সে আছে আমাদের নিজেরই হাতে। এই যে একটি পীড়িত মুমূর্ষু আত্মা বিদেশে আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে এক রকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী আমাদের এই সমাজ এবং তারই ভারবাহী আমরা। মানুষ হয়ে জন্মানর দরুণই সে রোগে সেবা পাবে, ঔষধ পাবে, পথ্য পাবে, এই অধিকার নিয়ে জন্মেছিল। আমরা তার সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি। এই বঞ্চনার ফাঁকি আজ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি নে বটে, কিন্তু এক দিন সে আত্মপ্রকাশ করবেই।

সামাজিক মানুষকে কতকগুলি বন্ধন স্বতঃই স্বীকার করে নিতে হয়—এই বন্ধনের দায়িত্ব পুরা মাত্রায় পালন করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের গৌরব। গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ কোন দিন এই নয় যে নিজের এবং সন্তানসন্ততিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু মাত্রই

বিধান করব—তার বাইরে আর দৃষ্টি চল্‌বে না। ছেলে পুলে আত্মীয় স্বজন দিয়ে হৃদয়কে সরস করে তোলাই গৃহস্থ জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিজের ছেলের ভিতর দিয়েই পরের ছেলেকে ভালবাস্‌তে শিখি, নিজের বন্ধুর ভিতর দিয়েই জীবনবন্ধুর সন্ধান পাই। এই বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েই বন্ধনের পারে যাওয়া যায়—একে বাদ দিয়ে নয়। ছোট পাওয়ার থেকেই বড় পাওয়া, অনন্তকে পাওয়ার সূচনা হয়।

"বেদপন্থী" একদিন লিখেছিলেন, মানুষকে দেখেই তার জাতিকে চেনা যায়। যে জাতির পরিচয় আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে এই রকম ভুল করে দিচ্চি, তারি গ্লানিকর চিত্র আমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠুক্‌, এই অধোগতি থেকে রুদ্র যেন আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন—"রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"।

সম্পূর্ণ।